জনসাধারণ এবং দেশের সাধারণ নির্বাচন

সক্ষমতার রাজনীতির একটি বয়ান*

কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের সাধারণ নির্বাচন। আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্বাচনের অর্থ হল, দেশের সংসদ বা লোকসভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাবে আপামর মানুষ। এবং তা পাঠাবে নিজেদের অঞ্চল থেকে। সেই প্রতিনিধিত্বের জন্য নানা দলের বা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীরা মনোনয়ন দেবে। মানুষ তার মধ্যে থেকে একজনকে ভোট দেবে। যে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে, সে জিতবে। এবার এই যারা জিতল নানা 'আসন' থেকে, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে দল বা জোট–এর, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন করবে এবং প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা ঠিক করবে। তারপর যারা সরকার গঠন করে, তারা ঠিক করে সরকারের মন্ত্রীসভা। লোকসভায় আসন সংখ্যা সাড়ে পাঁচশোর মতো। একেকটা আসনে ভোট দেয় প্রায় দশ লক্ষ বা তার বেশি মানুষ।

যারা নথিভুক্ত ভোটার, তারা ভোট নাও দিতে পারে। বা ভোট দিতে গিয়ে নোটা বা ওপরের–কেউ–নয় বোতামেও টিপতে পারে বা ভোট দিতে পারে। দেখা যায়, গড়ে প্রায় পঁয়ষট্টি সত্তর শতাংশ মানুষ ভোট দেয়, কোনও কোনও রাজ্যে সেটা আশি শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। 'ভারতীয় গণতন্ত্র'–র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো এই পঞ্চমবার্ষিক সাধারণ নির্বাচন।

এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কিন্তু ইংরেজি আমলের শেষে আমাদের দেশে এসেছে, অনেকটা পূর্বতন ব্রিটিশ শাসকদের নিজ দেশের ব্যবস্থার অনুকরণে। সারা পৃথিবীতেই কিন্তু এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা খুব পুরনো নয়, জ্ঞানী মানুষের (সেপিয়েন্স) সময়পর্যায়ের তুলনায় অতি নগণ্য, এমনকি

---

*মূল বয়ান শমীকের। সেটির ব্যাপক ঘষামাজায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করেছেন সৌভিক, শ্রীদীপ এবং বঙ্কিম। পরোক্ষে আরো অনেকে। বয়ানটির মূল অংশ 'কল্পসামাজিক কাগজ সর্বজনীন'–এর জানুয়ারি ২০২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস যদি কয়েক হাজার বছর ধরা হয়, তার তুলনায়ও বেশ আধুনিক।

আগেকার দিনে রাজা থাকত। তার ছেলে রাজা হত। তাদের কিছু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব মন্ত্রী সান্ত্রী থাকত। বাকিরা হত প্রজা। রাজারা শাসন করত, প্রজারা ছিল রাজার শাসিত এবং অনুগত। এখনও বাচ্চাদের গল্পে উপন্যাসে সেই রাজা–প্রজাদের কথা থাকে। আমরা ইতিহাস বইতে রাজাদের কথা পড়ি। অর্থাৎ রাজা হল অতীতের বিষয়। শাসন কে করবে সেটা যে শাসিত–রা মিলে ঠিক করতে পারে, এই ধারনা এসেছে অনেক পরে।

যদিও রাজা ইত্যাদিরা আসার আগেও একধরনের কৌম সমাজ ব্যবস্থা ছিল বলে শোনা যায়। যেখানে গোষ্ঠীপতি থাকত। সে অনেক বেশি মানুষের কাছাকাছি ছিল। এমনকি রাজা ইত্যাদিদের আমলেও এই ধরনের কৌম ব্যবস্থা বহাল ছিল বেশ অনেক জায়গায়। যাক সে কথা।

শাসনের বৃহৎ তন্ত্রে রাজতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্র আসার প্রক্রিয়ায় ফরাসী বিপ্লবকে বেশ মান্য ধরা হয়ে থাকে ইতিহাস বইগুলোতে। আমরা এই রচনার তৃতীয় অধ্যায়ে সেই ফরাসী বিপ্লবের প্রাকমুহুর্তের একটি নথি নিয়ে আলোচনা করব। আগে আমরা রাজতন্ত্রের স্থির–শাসকের সরল প্রক্রিয়ার চেয়ে কয়েক বছর অন্তর নির্বাচনে জিতে শাসক হবার গতিময় জটিল প্রক্রিয়া কেন অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক এবং আধুনিক সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করে নিই।

১ প্রতিযোগিতা

নির্বাচনের মধ্যে একটা জেতা–হারার ব্যাপার আছে, যে জেতা হারার কারণে খেলা এত পছন্দ হয় মানুষের। যে খেলায় জেতা হারার ব্যাপার নেই, তার মধ্যে কোনও মজা নেই। লোকের পছন্দও হয় না। যেমন টেস্ট খেলায় একসময় খুব ড্র হত। লোকে সেসব দেখতে চাইত না। এখন টেস্ট খেলায় আর ড্র হয় না, এমনভাবে পিচ বানানো হয়। তার ওপর ইংলন্ড ‘বাজবল’ বলে একটা ব্যাপার এনেছে টেস্টে, যাতে হারা–জেতা হবেই। অর্থাৎ, খেলার চেয়েও জেতা হারার ব্যাপার আছে বলেই খেলার এত গুরুত্ব।

ঠিক যেমন প্রতিযোগিতা বা কমপিটিশন। দৌড় প্রতিযোগিতা, ড্রয়িং কমপিটিশন, দিদি নাম্বার ওয়ান কমপিটিশন, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক, কুইজ কমপিটিশন, কন বনেগা ক্রোড়পতি থেকে শুরু করে ডান্স বাংলা ডান্স হয়ে বিগ বস কমপিটিশন — সেই কবেকার অলিম্পিক থেকে কী তারও আগে থেকে শুরু হয়েছে এই খেলা ইত্যাদির কমপিটিশন। কমপিটিশনের মূল ব্যাপার হল — কেউ ফার্স্ট হবে কেউ সেকেন্ড হবে কেউ থার্ড হবে ইত্যাদি। অর্থাৎ, নিজেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, কে হারে কে জেতে কে সেকেন্ড হয় ইত্যাদি কমপিটিশন হবে — তবে তাতে মানুষের আনন্দ।

মানুষ বাদে অন্য কোনও প্রাণী নিজেদের মধ্যে এই কমপিটিশন করে কি? খাবারের দখল নিয়ে, এলাকার দখল নিয়ে, দলের দখল নিয়ে, যৌনসঙ্গীর দখল নিয়ে প্রাণীদের মধ্যে লড়াই হয়। সে লড়াই সিরিয়াস, যে হারে সে আহত বা নিহত হয় বিজয়ীর হাতে, অথবা দূরে কোথাও চলে যায় বা পরিভাষায় পালিয়ে যায়। এই রেওয়াজ (হয়ত) প্রাণীদের দেখে মানুষও আয়ত্ত্ব করেছিল। লড়াই, যুদ্ধের মতো সিরিয়াস ব্যাপার এসেছিল। সে রেওয়াজ আজও আছে। এক প্রেমিকার দুই প্রেমিক থেকে শুরু করে এক ভূখণ্ডের দুই মালিক — এই নিয়ে লড়াই খুনোখুনি যুদ্ধ যে কত হয়েছে তার ইয়ত্ত্বা নেই। আমাদের সমস্ত মহতী কাব্য যুদ্ধ নিয়ে।

কিন্তু যুদ্ধ বা লড়াই এবং কমপিটিশন এক নয়। যুদ্ধ বা লড়াই কী তা তো আমরা সবাই কমবেশি জানি বা বুঝি। কিন্তু কমপিটিশন বা প্রতিযোগিতা কী তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা আছে। যুদ্ধ আমরা কমবেশি কেউই চাই না, কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায়, যুদ্ধ ছাড়া পথ নেই। যেমন, কেউ যদি আমায় আক্রমণ করে, সেক্ষেত্রে আমি যদি তার বিরুদ্ধ যুদ্ধ না করি, তাহলে জান মাল সব যাবে। অতএব যুদ্ধ, পরিভাষায় আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ — এর বিরোধিতা সচরাচর কেউই করে না, যদিও আমরা সবাই যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।

কিন্তু কমপিটিশন? আমরা সবাই কমবেশি কমপিটিশন পছন্দই করি। একটা ক্ষীণ মত আছে, কমপিটিশন ভালো নয়। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা চাই। কমপিটিশন নয়, কো-অপারেশন। কিন্তু ছোটোবেলা থেকে এত এত কমপিটিশনের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে তারপর যদি কমপিটিশনকে দুচ্ছাই করা হয়, তাহলে লোকে বলবে, তোমার জীবনে আর কমপিটিশনের প্রয়োজন নেই, খাওয়া পড়ার সুবন্দোবস্ত হয়ে গেছে, তাই তুমি কমপিটিশনকে দুচ্ছাই করছ। নইলে চতুর্দিকেই তো কমপিটিশন। একটা চাকরি, তার দশটা ক্যান্ডিডেট — কমপিটিশন। যোগ্যতমের চাকরি হবে। কমপিটিশন ছাড়া উপায় কী? ব্যবসা করবে, তারও কমপিটিশন। করোনার লকডাউনের সময় একটা মোড়ের মাথায় দশজন সবজির ভ্যানরিক্সা নিয়ে বসেছে। অত খরিদ্দারই নেই। বোঝাই যাচ্ছে, তিন মাস পরে ওই দশজনের মধ্যে থেকে এক কি দুই জন টিঁকবে। কমপিটিশন কোথায় নেই?

ইন্টারনেট ঘেঁটে পাওয়া যাচ্ছে, ইংরেজিতে কমপিটিশন শব্দটার উৎপত্তি হয়েছিল সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে, যখন তার মানে পাওয়া যাচ্ছে, কারোর সাথে শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া। সম্ভবতঃ ফরাসী থেকে বা অধুনালুপ্ত সংস্কৃতসদৃশ ভাষা ল্যাটিন থেকে। ফরাসীতে কমপেতে মানে ছিল শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু ল্যাটিনে কমপেতের -এর অর্থ ছিল 'একসাথে কোনও একটা কিছুর জন্য চেষ্টা করা'।

কমপিটিশন এর 'কম' শব্দাংশের অর্থ হল একসাথে। যেমন কমিউন শব্দ

এসেছে ওই ‘কম’ শব্দাংশকে প্রাধান্য দিয়ে, যার অর্থ একসাথে সবাই মিলে যাপন। কমিউনিকেশন মানে সংযোগ। অর্থাৎ ‘কম’ শব্দাংশের মধ্যে যৌথতার একটা ব্যাপার আছে। আর ‘পিট’ শব্দাংশের মধ্যে আছে ভীষণভাবে চাওয়া, কোনও কিছুর পেছনে পড়ে যাওয়া, কোনও কিছুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, এমনকি আক্রমণ করা। তাহলে কি কমপিটিশন মানে আগে ছিল একসাথে কোনও কিছুর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া? ঐক্যবদ্ধ, যূথবদ্ধ আক্রমণ? প্রাচীন ল্যাটিন নাকি তাই বলে। ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, প্রাচীন ল্যাটিন ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী কমপেট মানে হল একজায়গায় আসা, একমত হওয়া ইত্যাদি।

শব্দের অর্থের ইতিহাস থেকে মোটামুটি যা বোঝা যাচ্ছে, বহু আগে কমপিটিশন মানে ছিল একজোট হওয়া; তারপর বদলে গিয়ে হল একজোট হয়ে কোনও কিছুর জন্য ঝাঁপানো; তারপর আরও বদলে ইংরেজিতে বা ফরাসীতে হল (কোনও কিছু পেতে) নিজেদের মধ্যে শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া। বাংলাতেও আমরা যখন কমপিটিশনের অর্থে প্রতিযোগিতা বুঝি, তখন যা দাঁড়ায় তা হল — পারস্পরিক বিরোধিতামূলক যোগদান। সহযোগিতার ঠিক বিপরীত। তবে দুটোর মূল ব্যাপার একই, যোগদান।

এর থেকে বোঝা যায়, মানুষের সম্পর্কের দুটি মেরু — এক) সহযোগ, এবং দুই) প্রতিযোগ। সামাজিকতারও দুটি মেরু। ফলে কমপিটিশন সমাজের আভ্যক্তরীণ বিষয়। ভেতরের ব্যাপার। সামাজিকতারও ভেতরের ব্যাপার, সম্পর্কেরও ভেতরের ব্যাপার। তা সমাজ, সামাজিকতা, সমাজের বন্ধন থেকে শুরু করে সম্পর্ক — কোনওটাকেই আঘাত করে না; তাদেরকে আলগা করে না; বরং মানুষিক অস্তিত্বের মধ্যে একটি গতির সঞ্চার করে, যা সহযোগিতা করতে পারে না। মনুষ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ গতির জন্য দরকার কমপিটিশন। হয়ত গতির অন্য সূত্র হয় বা হতে পারে তলিয়ে দেখলে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এখনও মনুষ্য সমাজে প্রতিযোগিতা গতিসঞ্চার করে। [১]

ইদানিং কালে অবশ্য অনেক কম্পিটিশনেই জনতার ভোটে জাজমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইন্ডিয়ান আইডল বলে যে গানের প্রতিযোগিতা হয় বা হতো টিভিতে, তাতে জনতার ভোটে ঠিক হতো কে পরের রাউন্ডে যাবে। এখনকার অনেক টিভি প্রতিযোগিতাতেই তাই হয়। পরিভাষায়, অডিয়েন্স ভোট। ফলে কম্পিটিশনের ফার্স্ট সেকেন্ড জনভোট দিয়ে নির্ধারণ করা হয়ত বলা যেতে পারে একটা অত্যাধুনিক ট্রেন্ড। টিভি থেকে তা ঢুকে গেছে নির্বাচনেও।

নির্বাচন কীসের ভিত্তিতে করা উচিত ভোটদাতাদের, সে ব্যাপারে জনতাকে ওয়াকিবহাল করা বা পরামর্শ দেবার চেষ্টা করে সবাই। নেতারা, মিডিয়া, এবং পার্টি কর্মসূচীগুলি। নেতাদের তরফে এবং পার্টিগুলির তরফে এই ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা হয় লিফলেট, মাইকিং, সভা, টিভি বিজ্ঞাপণ,

দেওয়াল লিখন ইত্যাদির মাধ্যমে। মিডিয়া করে একটু সূক্ষ্মভাবে। কিন্তু নির্বাচন একটা কম্পিটিশন যেখানে জাজমেন্ট করবে জনতা — এরকম একটা ব্যাপার বেশ চালু হয়ে গেছে। ভোট দেওয়া মানে যে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করা — তার বদলে চলে এসেছে, ভোট দেওয়া মানে কমপিটিশনে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কে হবে তা ঠিক করে দেওয়া।

ফলে 'এলেবেলে' প্রার্থীরা আর গুরুত্ব পায় না। যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হতে পারবে তারাই গুরুত্ব পায়।

২ শাসক হবার বা বানাবার প্রতিযোগিতা

যদিও টিভির গান নাচের প্রোগ্রামের কম্পিটিশনে যখন অডিয়েন্স ভোটিং চালু হল তখন তার একটা দিক ছিল নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন। যেমন ইন্ডিয়ান আইডল গানের কম্পিটিশনে ২০০৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দার্জিলিং–এর একটা ছেলে। গোটা পাহাড় তাকে ভোট দিয়েছিল নিজেদের লোক হিসেবে। সে ভালো গান গায় অন্য কম্পিটিটরদের চেয়ে, তাই তাকে ভোট দিচ্ছে, এই কারণে নয়। এই ইন্ডিয়ান আইডল গানের কম্পিটিশন মোড়ে মোড়ে জায়েন্ট স্ক্রিন টাঙিয়ে দেখিয়ে, প্রশান্ত তামাং–এর জন্য ভোট আয়োজন করেছিল বিমল গুরুং–রা।

দার্জিলিং–এর নেপালি জনজাতিগুলির গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়েছিল ওই সময়, বিমল গুরুং–এর নেতৃত্বে; যা তারপর এক দশক ধরে পাহাড়ের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ওই সময় গানের কম্পিটিশনের জাজমেন্ট ভোটিং বদলে গেছিল জনপ্রিতিনিধি নির্বাচনে; তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু জনপ্রতিনিধি নির্বাচন যে গানের কম্পিটিশনের জাজমেন্ট ভোটিং–এ বদলে গেল ধীরে ধীরে, তা সেরকমভাবে আলোচনায় এল না কোথাও।

আসবেই বা কী করে? মিডিয়া এবং ইন্টেলেকচুয়াল মহল তো ব্যস্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের রেওয়াজের সমালোচনায়। ''ওরা অশিক্ষিত বিহারী, নিজেদের জাতের লোকেদের ছাড়া কাউকে ভোট দেয় না'', ''ওরা কমিউনাল মুসলিম, নিজেদের ধর্মের লোকেদের ছাড়া কাউকে ভোট দেয় না'' ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে আলোচনার বিষয়বস্তু। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী, বলিয়ে কইয়ে, বড়ো–চাকরি–ছেড়ে–রাজনীতি–করতে–আসা, ডাক্তার–উকিল–সেলিব্রিটি–প্রফেসর ইত্যাদিদের মধ্যে ভোট দেওয়াকে বানানো হল মহত্তর ভোটদান — কারণ এরা যেহেতু অন্য কিছুতে যোগ্য বলে প্রমাণিত, তাই এমএলএ/এমপি হবারও যোগ্য। এভাবে আস্তে আস্তে জনপ্রতিনিধির বদলে নির্বাচন হয়ে দাঁড়ালো কম্পিটিশনের জাজমেন্ট ভোটিং–এর মতো। যদিও ভেতরে ভেতরে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ফল্গুধারা যে রয়েই গেছে তার প্রমাণ পাওয়া

যায় — শুধু ‘কাজের মানুষ’ বললে হয় না, বলতে হয় ‘কাজের মানুষ, কাছের মানুষ’।

আগেই বলা হল, যারা জিততে পারবে তাদের মধ্যে থেকেই ভোট দেওয়ার রেওয়াজও চালু হল। হিসেব করলে দেখা যাবে, আগে মূলধারার বাইরের পার্টিগুলি এবং নির্দলরা যত ভোট পেত তা কমতে থেকেছে ক্রমশ, তার বদলে মূল ধারার পার্টিগুলির ভোট পাওয়ার হার গেল বেড়ে। বড়ো পার্টিগুলি সরাসরি প্রতিটি নির্বাচনী জনসভা থেকে বলতে লাগল — ‘কেন ছোটো পার্টিগুলিকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করবেন? সরকার তো গড়ব আমরাই। আমাদের ভোট দিন।’ একটা টার্ম খুব জনপ্রিয় হল, ‘ভোট কাটুয়া’। অর্থাৎ, যারা মূল বড়ো পার্টিগুলি হকের ভোট নিয়ে নেয়। যেন জনতার ভোট বড়ো পার্টিগুলির বাপের সম্পত্তি। শাসকের এবং হবু শাসকের এইসব ঔদ্ধত্যকে আর ঔদ্ধত্য বলে মনে হতে লাগল না, মনে হতে লাগল এটাই স্বাভাবিক।

এই যে ‘জনপ্রতিনিধি নির্বাচন’ রূপান্তরিত হল ‘শাসক হবার কম্পিটিশনের ভোটিং’-এ — এর ফলে কি আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনও ক্ষতি হল? ভোটদানের হারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখলে মনে হবে না কোনও ক্ষতি হয়েছে। মনে হবে, এই তো লোকে এই পরিবর্তিত ব্যবস্থাটাকেই ন্যায্যতা দিচ্ছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই।

চালু যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক দিকটি রাখার ব্যাপারটি যদি জনতাও আর মাথায় রাখতে না চায়; যদি তা সংস্থাগুলির (পার্টি, নির্বাচন কমিশন, সরকার, আমলাতন্ত্র, মিডিয়া ইত্যাদি) দিক থেকে যেমন শাসক হবার কম্পিটিশনে পরিণত হয়েছে, জনতার দিক থেকেও যদি সেইরকম একটি কম্পিটিশনে পরিণত হয়; তাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক দিকটি আর থাকে না। ফলে রাষ্ট্র জনতার প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ক্ষমতার গড়নের মধ্যে জনতা থাকে না আর। রাষ্ট্র হতে শুরু করে জনতার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি অস্তিত্ব, জনতার অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যেমন ছিল রাজার শাসনে। অর্থাৎ, *জনপ্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে উঠতে থাকে প্রতিযোগিতামূলক রাজতন্ত্র।*

৩ গণতন্ত্র

আধুনিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা এবং তার নানারকম বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে। ফ্রান্সে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে রাজা ষোড়শ লুই ডাক দিয়েছিলেন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ফরাসী সংসদ বা এস্টেট জেনারেল -এর নির্বাচন; যাদের কাজ হবে

রাজাকে সুমন্ত্রণা দেওয়া — অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়। স্থানীয় স্তর থেকে একাধিক স্তরের নির্বাচনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে তৈরি হবে সেই এস্টেট জেনারেল। সেই নির্বাচনকে ঘিরে শুরু হল প্রচার, হাজার হাজার প্যামপ্লেট লেখা হল। ফরাসী গ্রাম বা কমিউনগুলিতে যেন নবজোয়ার আসল।

পেশায় এক ধর্মযাজক আবে সিয়েস লিখেছিলেন, 'কেস–ক–সে ল্য তিয়ের এতা (তৃতীয় বর্গ কী)?' নামের একটি প্যামপ্লেট (জানুয়ারি ১৭৮৯)। উল্লেখ্য, সেই সময়ের ফ্রান্সে তৃতীয় বর্গ বলতে ধরা হত — ধর্মীয় সংস্থা এবং রাজণ্যবর্গ বাদে যারা তাদের। যাই হোক। এই প্যামপ্লেটে বলা হয়েছিল, ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত যারা এবং রাজণ্যবর্গ বা অভিজাত যারা — এই দুই বর্গের লোকেরা ফ্রান্সে বিশেষ সুবিধাভোগী। তারা সাধারণ আইনের আওতায় পড়েন না। কিন্তু ফ্রান্সের আসল বর্গ হল ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ। তারাই সব। তারাই পুরো ফরাসী জাতি।

আবে সিয়েস প্রথমেই ফ্রান্সের সাধারণ মানুষকে বলেছিলেন ব্যক্তি বা ইন্ডিভিজুয়াল, যাদের মোটের ওপর চারটে শ্রেণী বা ক্লাসে ভাঙা যায় – – কৃষক, শ্রমিক, বণিক ও ব্যবসায়ী (বুর্জোয়া), এবং অন্যান্য পেশা ও কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষ। অর্থাৎ, আবে সিয়েস–এ তথা ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিকে যে সেন্টিমেন্ট প্রাধান্য পেয়েছিল, তা হল — আইনের চোখে সবাই সমান হবে ফ্রান্সে। কারোর কোনও আলাদা অধিকার থাকবে না। সবাই হবে সাধারণ মানুষ। প্রশ্নটা ছিল, ফরাসী সংসদ কাদের নিয়ে তৈরি হত? আবে সিয়েস বলেছিলেন, ফরাসী সংসদ তৈরি হত ওই দুই সুবিধাভোগী বর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে। তথাকথিত তৃতীয় বর্গের প্রতিনিধি বলে যাদের ধরা হয়, তারা আসলে কোনও না কোনওভাবে অভিজাতদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ বা নব্য অভিজাত।

আবে সিয়েসের সিদ্ধান্ত ছিল — "এতাবৎ তৃতীয় বর্গের কোনও সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব ছিল না ফরাসী সংসদে (এস্টেট–জেনারেল)। ফলে তার রাজনৈতিক অধিকার ছিল শূণ্য"। তাঁর বক্তব্য ছিল, যদি সংসদ সত্যি সত্যিই সাধারণের ইচ্ছার বিশ্লেষণকারী হয়, এবং তা নয়া আইন প্রণয়নের অধিকারী হয়, তাহলে তো ভালোই, এবং তাকে সর্বোচ্চ বলাই যায়। কিন্তু তৎকালীন ফরাসী সংসদ করণিক–অভিজাত–বিচারপতিদের সম্মেলন মাত্র।

আবে সিয়েস সমাধান হিসেবে বলেছিলেন, ১) সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে তাদের সত্যিকারের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হবে সংসদে যারা সাধারণ মানুষের (তৃতীয় বর্গের) আশা আকাঙ্খার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে সেখানে। ২) সংসদে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধির সংখ্যা বাকি দুই বর্গের প্রতিনিধির অন্ততঃ সমান হতে হবে। ৩) সংসদে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গোণাগুনতি

হতে হবে বর্গ ধরে নয় (অর্থাৎ কোন বর্গের অধিকাংশ কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেটাই সেই বর্গের সিদ্ধান্ত, এবং আন্তঃবর্গ সিদ্ধান্তের যোগবিয়োগফল হল সংসদের সিদ্ধান্ত — এভাবে নয়); মাথা ধরে, অর্থাৎ প্রতিনিধিপিছু এক ভোট ধরে। অর্থাৎ, যাতে কোনওভাবেই অন্য দুই বর্গের প্রতিনিধিরা আপসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যেতে না পারে।

সিয়েস ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের সত্যিকারের প্রতিনিধি মানে যার আগেপিছে কোনও সুবিধাভোগ নেই। অভিজাতরা নিজেদের ছেলেদের সাধারণ মানুষ সাজিয়ে প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেবে, তা হবে না। আবে সিয়েস একে বলেছিলেন, এটা তৃতীয় বর্গের বা সাধারণ মানুষের তরফে 'কিছু' অধিকারের দাবি মাত্র।

পরে ফরাসী বিপ্লবে জল অনেক দূর গড়িয়েছিল, সংসদ বসে রাজাকে হটিয়ে দিয়ে নিজেকে নীতিনির্ধারক ঘোষণা করেছিল, যা–ই হল ফরাসী বিপ্লব। এবং আবে সিয়েস তার জঙ্গিত্ব ধরে রাখতে পারেননি বা ফরাসী বিপ্লবের বৈপ্লবিক জঙ্গিত্বের মুখে পড়ে পিছু হটেছিলেন, সে আলাদা কথা; অনেক বিপ্লবীই বিপ্লব এগোনোর সাথে সাথে প্রতিক্রিয়ার দলে যোগ দেয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র সম্পর্কে আবে সিয়েসের চেতাবনি খুবই জঙ্গী ছিল সে সময়, তা এখনও স্বীকৃত।

আবে সিয়েস একটি জাতির 'টিঁকে থাকা ও উন্নতি করা'র জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডকে দুইভাবে ভাগ করেছিলেন, নিজস্ব কাজ (ত্রাভো পার্তিকুলিয়ের বা পার্টিকুলার ওয়র্ক) এবং সর্বজনীন ক্রিয়া (পাবলিক ফাংশান)। আগেই বলা হয়েছে, নিজস্ব কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাজনের মাধ্যমে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন সিয়েস — কৃষক, শ্রমিক, বুর্জোয়া, অন্যান্য (শিল্পী বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে ডোমেস্টিক হেল্প)। এই চারটি শ্রেণী নিয়েই তৈরি তৃতীয় বর্গ বা সাধারণ মানুষ।

একইসাথে সর্বজনীন ক্রিয়াকেও চারভাগে ভাগ করেছিলেন সিয়েস। সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এবং আমলাতন্ত্র — যে কাজগুলোর 'কুড়িভাগের উনিশভাগই' করে তৃতীয় বর্গের লোকেরা, কিন্তু কোন কাজগুলি? যেগুলি প্রথম দুটি বর্গের লোকেরা করতে চায় না। প্রথম দুটি বর্গের লোকের এই সর্বজনীন ক্রিয়াগুলির মধ্যে উচ্চ বেতনের এবং উচ্চ সম্মানের কাজগুলিই কেবল করে। এবং সেই উচ্চ বেতন ও উচ্চ সম্মানের কাজে তৃতীয় বর্গের প্রবেশাধিকার নেই। যদি এই সুবিধাভোগীদের একচ্ছত্র অধিকার না হত উঁচু পোস্টগুলো, তাহলে তৃতীয় বর্গের লোকেরা যেতে পারত সেখানে, ভালো কাজের পুরস্কার স্বরূপ প্রমোশন পেয়ে।

সিয়েসের কল্পনার আধুনিক রাষ্ট্র বাস্তবায়ন হতে হয়ত অনেক সময়

লেগেছে, তার বেশ কিছু বদলও ঘটেছে ফরাসী বিপ্লবের সময় পরিসরে — কিন্তু মূলগতভাবে এই আধুনিক রাষ্ট্র কি পরিবর্তিত হয়েছে ? – – না, মূলগতভাবে একই আছে। ক্ষমতা বিভাজিত নীতি নির্ধারণ তথা আইন প্রণয়ন এবং তার রূপায়ণে। আইন প্রণয়নকারী সংস্থাটি ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা। রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি — স্থায়ী রাষ্ট্রযন্ত্র — আমলা, পুলিশ–প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা — তারা বেতনভূক সুস্থায়ী চাকুরিরত, কিন্তু ট্রান্সফারেবল। নীতি নির্ধারণকারী — পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত সংসদ। বেতন ও পেনশন এদেরও আছে কিন্তু তা মূল বিষয় নয়। পাঁচ বছর পর পর জনতা ভোট দিয়ে এই ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থাটির সভ্যদের নির্বাচন করে, অর্থাৎ তারা জনপ্রতিনিধি। পাঁচ বছরে ওই একবারই জনতার সক্রিয় হবার সুযোগ আছে এই ক্ষমতা তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায়। পাঁচ বছরের মধ্যে জনতার তাকে ফিরিয়ে নেবার কোনও অধিকার নেই, এমনকি দল ও মত বদলে ফেললেও।

আমাদের দেশে অতিরিক্ত যে ব্যাপারটুকু আছে সেটা হল, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে ‘পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী’ দিয়ে গঠিত আরেকটি রাষ্ট্রক্ষমতা (যার চলতি নাম রাজ্য সরকার) এবং এই দুই রাষ্ট্রক্ষমতার (রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার) পারস্পরিকতা এবং এক্তিয়ারের ভাগাভাগি। এই আঞ্চলিকতা সাংবিধানিকভাবে বড়োমাপের ভাষা সংস্কৃতি দিয়ে নির্ধারিত — অর্থাৎ, রাজ্যগুলি ভাষাভিত্তিক।

যে প্রশ্ন আবে সিয়েসকেও করা যেতে পারে, এবং সামগ্রিকভাবে এই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে — জনগণ কেন ভোট দেবে? ফরাসী বিপ্লব শুরুর সময় জনগণ ভোট দিতে দিতে গেছিল, কারণ অনেকদিন পরে ফরাসী সংসদের ভোট হচ্ছে (সম্ভবতঃ দেড়শো বছর পর); তাছাড়া ফ্রান্স তখন অভাবনীয় অর্থনৈতিক সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছিল। ফলে যেভাবে ফরাসী রাষ্ট্র তখন চলছিল তার খোলনলচে বদল করার দরকার হয়ে পড়েছিল। সেই খোলনলচে বদলেরও ডাক এসেছিল ওপর থেকেই, রাজার তরফ থেকে। কিন্তু রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেই বদলে দিল সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ফরাসী সংসদ। ঠিক আছে, কিন্তু বারবার জনগণ ভোট দেবে কেন?

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধরে নেয়, এই জনগণ হচ্ছে তাকে নিয়ম করে বার বার পুনরুজ্জীবিত করার উপায়। সেই কারণে এই ব্যবস্থার নাম গণতন্ত্র। তন্ত্রের ইংরাজি বা ল্যাটিন শব্দ হল ক্রেসি, যার অর্থ হল বল। ফলে *গণতন্ত্র শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল গণ–র গুঁতো।* গণতন্ত্র রক্তমাংসের মানুষকে ‘গণ’ হিসেবে বিবেচনা করে — ক্ষমতার রাজনীতির সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ

থেকে। যেখানে মানুষের কাজ হল ক্ষমতাকে নিয়ম করে গুঁতো দিয়ে দিয়ে সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও সজীবকরণ করা। এটাকেই বলা হয় রাজনীতি। আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতার অছি বা কেয়ারটেকারের সমর্থন বা পরিবর্তন, এবং রাষ্ট্রক্ষমতার পরিমার্জন, সংশোধন ও সজীবকরণ — রাজনীতির অর্থ দাঁড়ায় এটাই।[২]

৪ ক্ষমতার রাজনীতি

কিন্তু রাজনীতির এই একমেবাদ্বিতীয়ম অর্থকে যদি প্রশ্ন করা যায়? যদি রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকে নিরন্তর পরিবর্তন পরিমার্জন সংশোধন করে চলাই রাজনীতি — এটা আমরা না মানতে চাই? যদি মানি, তাহলে এই উদ্দেশ্যের বাইরের কারোর যন্ত্রণার চিৎকার বা বঞ্চনার বোধের উদ্‌গীরণের কোনও অর্থ থাকে না; কোনও সামাজিক উদ্যোগেরও অর্থ থাকে না; সেগুলোকে বলতে হয় অরাজনীতি বা উদ্দেশ্যহীন কলরব।

আর যদি না মানি, তাহলে রাজনীতি বলতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যা মানে করা হয় — তাকে এক ধরনের রাজনীতি বলতে হয়; এবং রাজনীতির অন্য কোনও ধরনের কথা ভাবতে হয়। রাজনীতি বলতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যা মানে করা হয়, আমরা যাপনবাদে* তাকে বলেছিলাম ক্ষমতার রাজনীতি। আর এই ক্ষমতার রাজনীতিকে খর্ব করা দুর্বল করা তথা শাসনহীন স্বয়ংচালিত মানবসমাজের ইউটোপিয়াকে বলেছিলাম সক্ষমতার রাজনীতি। ক্ষমতার রাজনীতির কিছুটা ব্যাখ্যা আমরা যাপনবাদের মূল বয়ানে রেখেছিলাম। এখানে তার অংশবিশেষ দেওয়া হচ্ছে —

> “আরেকটি স্তর হল জাগতিকের ‘ওপর’–এর একটি স্তর। এবং সেই স্তর মোটেই আসল কোনো স্তর নয়। এই স্তরকে বলা যেতে পারে মেটাফিজিক্যাল স্তর। ... ওই ওপরের স্তর হল বিশেষণের স্তর, গুরুত্বের স্তর, ল্যাজের স্তর, ওজনের স্তর, ভারের স্তর। ... মানুষ সেলিব্রিটি বানায়। বিশেষণ বানায়। শাসক বানায়। বিরোধী বানায়। আইন বানায়। আদালত বানায়। সারি সারি পদ, পোস্ট বা চেয়ারকে মেনে নেয় যারা সেই আইন মানতে বাধ্য করবে মানুষকে। ... মানুষই জিইয়ে রাখে এই ওপরের স্তর। ... বিশেষণের স্তর হল কল্পিত বাস্তব। বিশেষণের স্তরের বাস্তব হাত পা মুণ্ডু মাথা আছে। লাঠি আছে বন্দুক আছে জেলখানা আছে। টাকা আছে। গাড়ি আছে বাড়ি আছে হেলিকপ্টার আছে। টিভি আছে কাগজ আছে পোর্টাল আছে সর্বক্ষণের। ভালো ক্যামেরা আছে। ভাড়াটে

*https://archive.org/details/japonbad

> বাহিনী আছে, দালাল আছে, স্তাবক আছে। তাদের কাজ কী? মোদ্দা কথায় তাদের কাজ হল এই বিশেষণের স্তরকে টিঁকিয়ে রাখা। ... নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় এই বিশেষণের স্তর নিজের আওতার মধ্যে রাখতে চায় মানুষের জাগতিক স্তরকে। জাগতিক স্তরে নানা ধরনের সিঁড়িও বানিয়ে রাখে এই বিশেষণের স্তরে 'ওঠা'-র জন্য। এই নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা ভাঙা গড়া চলে, শাসক-বিরোধী বদল চলে, ... কিন্তু একে যাতে 'টিঁকে থাকার যুদ্ধ' বলে লোকে বুঝে না ফেলে, তাই জন্য একে উল্টো করে হাজির করা হয় মনুষ্য সমাজে বা মানুষের জাগতিক পরিসরে। মানুষের জাগতিক পরিসরের নানা স্থিতিশীল ও সুনির্দিষ্ট বড়োমাপের বিভাজনের মধ্যেকার ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়ে (যেমন কৃষকের ভালোমন্দ কৃষকের থেকে বেশি বোঝে মন্ত্রীরা ইত্যাদি), এবং, নানা গতিশীল এবং ছোটোমাপের বিভাজনের টানাটানিকে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়ে (যেমন কোনো কারখানার শ্রমিকদের ইউনিয়নকে বা ছাত্র ইউনিয়নকে শাসক বা বিরোধী পার্টির পেটোয়া-তে পরিণত করা) সে তার অত্যাবশ্যকতা আরোপ করে মানুষের জাগতিক পরিসরে। বিশেষণের স্তরের টিঁকে থাকার যুদ্ধের এই (উল্টো) উপস্থাপনাই হল, যাকে আমরা বলি ক্ষমতার রাজনীতি ...''।

বস্তুতপক্ষে, ক্ষমতার রাজনীতির কাজই হল ক্রমাগত রক্তমাংসের মানুষের আশা আকাঙ্খা বাসনা ইত্যাদি জাগতিক পরিসরের বিষয়গুলিকে, যার খানিকটা অংশ সক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় — তার আইনিকরণ বা ক্ষমতার বয়ানে সেগুলিকে রূপান্তর করা। মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তর বা উল্টোভাবে উপস্থাপিত করার কাজটা যে যতটা সফলভাবে করতে পারে, সে ক্ষমতার রাজনীতিতে তত গুরুত্বপূর্ণ।

এই কাজ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়ী রাষ্ট্রযন্ত্র অংশটি, অর্থাৎ আমলা-রা এবং বিচারপতিরা খুব সফলভাবে করতে পারে না, কারণে তারা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত, ফলিতভাবে কাজটির শেষটুকু অর্থাৎ আইনের বয়ানে লিপিবদ্ধ করার কাজটিতে দক্ষ, কিন্তু গণরাজনীতির অভিজ্ঞতা নেই। সেই কারণেই আমলাদের দিয়ে রাষ্ট্র চলতে পারে, কিন্তু তারা জাগতিক পরিসর থেকে ছেনে নিয়ে আসা মানুষের বাসনাগুলির নিরন্তর ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তর ঘটাতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় ক্ষমতার রাজনীতির দলগুলির বা নেতাদের। এই কারণে ক্ষমতার রাজনীতিতে জননেতাদের কদর বেশি (মমতা, লালু, শুভেন্দু, মোদি)। কে কতটা সফলভাবে পারল

এই রূপান্তর ঘটাতে, তার পরীক্ষা হয় লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে।

তবে সবসময় যে জননেতারাই এই কাজটি পারে, তা নয়। অনেক সময় জাগতিক পরিসর বা জনপরিসরে শিকড় গেড়ে থাকা সংসদীয় পার্টিগুলিও পারে। যেমন, একসময় এই কাজ খুব দক্ষভাবে করেছে কংগ্রেস। পরে সিপিএম–সিপিআই সহ বামপন্থী এবং সমাজবাদী সংসদীয় দলগুলি করেছে।

২০০৪–০৯ সালে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার যে বেশ কয়েকটি আইন করতে পেরেছিল, তার একটা বড়ো কারণ ছিল, সিপিএম–সিপিআই সহ বামপন্থী সংসদীয় দলগুলি, এবং বিএসপি–এসপি–আরজেডি–র মতো সমাজবাদী সংসদীয় দলগুলি সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া এনজিও–রা সেই সময় থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে জনপরিসরের আশা–আকাঙ্খার ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তরের কাজে। কীভাবে জনপরিসরের আশা–আকাঙ্খা এবং সক্ষমতার রাজনীতির বিষয়গুলি ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তরিত করে আইনগুলি করা হয়েছিল, তা নিচে দু'টি উদাহরনের সাহায্যে বলা হচ্ছে।

১) মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (১০০ দিনের কাজ) : ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লোকসভা থেকে পাশ হয় এবং ২০০৬ সালের মধ্যে লাগু হতে শুরু করে ও ২০০৮ সালের মধ্যে গোটা দেশের সমস্ত গ্রামীন জেলায় লাগু হয়ে যায়। ২০০৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ছিল এই একশ' দিনের কাজ। যদিও এই আইনের পূর্বসুরী ছিল বহু কাজের আইন, যেমন, NREP (1980-89), RLEGP (1983-89), SGRY(2001-06), NFFWP(2004-06) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে শেষ দুটি ১০০ দিনের কাজ শুরু হওয়া অব্দি চালু ছিল।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল — ১০০ দিনের কাজের আইন হবার আগের এই কাজের আইনগুলি সবগুলিই তৈরি করা হয়েছিল আমলা স্তরে, এবং এগুলি সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে কাজের সুযোগ ছিল মাত্র, কোনওভাবেই 'সমস্ত ইচ্ছুক ঘরের প্রাপ্তবয়স্কদের অন্ততঃ একশ দিনের অদক্ষ কায়িক কাজের গ্যারান্টি' – এই মর্মে কোনও কিছু ছিল না। একইসাথে এগুলিতে গ্রামীন সম্পদ তৈরির কোনও উদ্দেশ্য জড়িত ছিল না। গ্রামীন মানুষের মধ্যে যাতে লিঙ্গ–জাত ইত্যাদিতে কারণে সামাজিক–অর্থনৈতি ভাবে পিছিয়ে থাকা অংশ অগ্রাধিকার পায়, তারও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অর্থাৎ, এগুলি রাষ্ট্রের প্রয়োজনসাপেক্ষ কাজের আইন ছিল, গ্রামীন মানুষের বাসনা যদি ধরি এইরকম — নিজেদের গ্রামগঞ্জের প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং তার বিনিময়ে মজুরি — তার কোনও আইনিকরণ ছিল না।

একশ' দিনের কাজের আইনের মধ্যে দিয়ে এই প্রথম গ্রামীন মানুষের

কৌম শ্রমের বাসনা* সফলভাবে অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রের খাতায়। এর আগে মহারাষ্ট্রে খরার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২–৭৩ সাল থেকে কয়েকবছর চলা একটি স্কিম–কে (মহারাষ্ট্র এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম) এই একশ' দিনের কাজের আইনের আসল পূর্বসুরী বলা যেতে পারে।

একশ' দিনের কাজের আইনের আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হল — তা নয়া–উদারনীতির জমানায় 'কাজের বাজার'–এ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, কারণ এই কাজ সরাসরি বাজারের চাহিদা সাপেক্ষ নয়। এই কাজের মাধ্যমে যে গ্রামীন সম্পদ তৈরি হচ্ছে তা বাজারী সম্পদ নয়। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে সম্পদ ও কাজের রূপরেখা তৈরি হবার কথা। এবং এই সম্পদ নির্মাণে মোট ব্যায়ের ষাট শতাংশ যেন অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হয়; এবং বাকি চল্লিশ শতাংশ দক্ষ শ্রমের মজুরি ও মাল–মেটেরিয়ালের খরচ; মেশিন ব্যবহার করা যাবে না, তা আইনেই বলা ছিল; যার অর্থ, এই সম্পদ সৃষ্টি শ্রমনিবিড়। যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে, তা কাজের বাজারে অদক্ষ–শ্রমের যে মজুরি তার তুল্য।

পরে ২০১১ সালের সংশোধনীতে কাজের নকশায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা খর্ব হয় এবং তা ব্লক–স্তরের প্রশাসনে নিয়ে যাওয়া হয়; ২০১২ সালের সংশোধনীতে মেশিনের ব্যবহারে অনুমোদন দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির ব্যক্তিগত জমির কাজকে একশ' দিনের কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; বেসরকারি ঠিকাদারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; নানা সরকারি প্রকল্পের কাজকে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

অর্থাৎ, 'গ্রামের লোকেদের নিজস্ব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নকশা করা গ্রামীন সম্পদ সৃষ্টির কাজে গ্রামীন গরীব মানুষের বছরে অন্ততঃ একশ' দিনের কায়িক কাজের অধিকার' — আইনের এই বয়ান বদলে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে ক্ষমতা ও পুঁজির বয়ান (সরকারি কাজ ও মেশিনের অন্তর্ভুক্তি, গ্রাম পঞ্চায়েতের বদলে ব্লক–প্রশাসন স্তরে কাজের নকশা, ব্যক্তিগত কৃষিকাজে এর ব্যবহার) এই আইনের মধ্যে সংহত হতে থাকে। এর সঙ্গে ছিল নানা দুর্নীতি, একশ'–র বদলে অনেক কম দিন কাজ, ও মজুরি পেতে দেরি হবার সমস্যা।

দুর্নীতির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল (যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং যে অভিযোগের কারণে পশ্চিমবঙ্গে এখন একশ' দিনের কাজ বন্ধ / টাকা বকেয়া হয়ে আছে) — কোনও কাজ না হওয়া সত্ত্বেও খাতায় কলমে কাজ দেখিয়ে পয়সা নেওয়া যার একটা অংশ কেবল নথিভুক্ত শ্রমিকের হাতে যাচ্ছে, বাকিটা শ্রমিকের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে পঞ্চায়েতের বা শাসক

*যা হয়ত প্রাক–পুঁজিবাদী প্রাক–আধুনিক গ্রামসমাজে কৌমের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম হিসেবে বা দান করা শ্রম হিসেবে পরিগণিত হত, 'আজ মঙ্গলবার, আজ পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন'

পার্টির নেতারা, এবং যার হিস্যা পাচ্ছে ব্লক প্রশাসন।

এছাড়া বছরে একশ' দিন বা তার বেশি দিনের বদলে কম দিন কাজ মানেই হল, এই একশ' দিনের কাজের চরিত্র গ্রামীন মানুষের কাজের চাহিদা বা বাসনার দিক থেকে না ঠিক হয়ে ঠিক হচ্ছে কতটা কাজ দেওয়া যাচ্ছে তার ওপর। স্থানীয়ভাবে কাজের চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টিশীলভাবে গ্রামীন সম্পদ তৈরির নকশা নির্মাণের বদলে তা মৌলিকভাবে হয়ে যাচ্ছে — ওপর থেকে বা প্রশাসনের থেকে কতটা কাজের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে গ্রামে, তার ওপর।

প্রসঙ্গতঃ এই একশ'র কম দিনের কাজ প্রথম থেকেই এই আইনের রূপায়ণের নিত্যসঙ্গী (কোনো বছরই প্রায় পঞ্চাশ দিন পেরোয়নি), যা দেখায়, প্রথম থেকেই আইনটি হল মানুষের বাসনার ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তরিত বা উপস্থাপিত প্রকাশ। একশ' দিনের কাজের গ্যারান্টি আইনের রূপায়ণের এই মৌলিক সীমাবদ্ধতাটি আসলে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য — তা মানুষের বাসনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নয়, তার রূপান্তরিত, উল্টো বয়ানের, এবং উপস্থাপিত প্রকাশ। একশ' দিনের কাজের মতো তার সর্বাধিক প্রগতিশীল আইনও তাই। তাই প্রথম থেকেই মানুষের কাজের চাহিদার বদলে ব্যবস্থা থেকে উৎসৃত কাজের সুযোগ — সেটাই হয়েছে এই কাজের আইনের রূপায়ণ।

এটা আরও দেখায় — শুধু আইনের বয়ান নয়, তার রূপায়ণেও উন্মোচিত হয় ক্ষমতা বয়ান। *

২) হকার আইন : হকার আইনের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনের বাজারহাট বসানোকে ক্ষমতার বয়ানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ হকারের বাস্তবতা পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারও বুঝতে পারেনি। হকার যে একটা ইতিবাচক ব্যাপার, একটা যাপন — সেটা বুঝতে না পেরে ভারীশিল্পশ্রমিকে অন্ধ পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতি ও বাম সরকার আশির দশক থেকে তাকে নেতিবাচক ভাবে দেখতে শুরু করে। হকারকে দেখানো হয়েছিল সত্তরের দশকে ভারী শিল্প কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদির ফল হিসেবে।

মুশকিলটা হল, ভারী শিল্প কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে লোকে আরো হাজারটা জিনিস করতে পারত, করেওছে, যেমন গ্রামে ফিরে চাষে মনোনিবেশ করা কিংবা গুণ্ডামি করা ইত্যাদি। কিন্তু সেসব না করে এই যে হকারি করতে শুরু করল লোকে, এইটা যে একটা ইতিবাচক যাপন, জনগণের সৃজন — এটা কখনওই বাম রাজনীতি বোঝেনি। সেসময়কার বিরোধী কংগ্রেসী রাজনীতিও বোঝেনি। সেসময় বাম রাজনীতির ভেতর থেকে যেসব নাটক

*আইনের তথ্যগুলি এই লিঙ্ক থেকে নেওয়া'https://www.iimidr.ac.in/wp-content/uploads/Vol8-2-MGNR.pdf

ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, প্রায় সবগুলোতে হকারিকে নেতিবাচক পেশা হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রগতিশীল হিসেবেই পরিচিত অঞ্জন দত্ত গান লিখেছিলেন, "দাদা একটা মিনি হবে কি, একটাও লেবু হয়নি বিককিরি", যা নব্বইয়ের দশকের শহুরে ছাত্র যুবদের মুখে মুখে ঘুরত। এই নেতিবাচকতা থেকেই নব্বইয়ের দশকে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর 'অপারেশন সানশাইন' (হকার উচ্ছেদ), বা ওসব করে হকার তুলে দিতে না পেরে শেষমেশ হকার্স মার্কেট তৈরি করার চেষ্টা।

এই হকার্স মার্কেট তৈরি করার চেষ্টাও হকার নামক জনগণের সৃজনটিকে ক্ষমতার চোখে উপস্থাপিতভাবে বা বিপরীতদৃষ্টিতে দেখার ফল। ক্ষমতা ভাবল, হকার কেন তৈরি হচ্ছে? বেকারির কারণে। অতএব এদের দোকান দিয়ে দাও। তাহলেই হবে। কিন্তু ভেবে দেখল না, হকারি ব্যাপারটা কী? যেখানে হকাররা বসে, সেখানে কেন বসে? হকাররা সেই সময় হকার্স মার্কেট–এর বিরোধিতা করেছিল, বলেছিল, যে জায়গা লোকের প্রতিদিনের আসা যাওয়ার রাস্তার মধ্যে পড়ে না, সেখানে হকার্স মার্কেট করে কী হবে? লোকই তো আসবে না। হকার তো আর বাজার নয়। আস্তে আস্তে দেখা গেল, হকার্স মার্কেট গুলো বাজার হয়ে গেল, আর পুরনো জায়গাগুলোয় ফের হকাররা বসে গেল।

এখানে একটা প্যাঁচের কথা শোনা যায়, সেটাও ক্ষমতার বয়ান, যে, হকারদের তো বসিয়েছে শাসক পার্টির লোকাল নেতারা। না, তারা বসায়নি। হকাররা আগে বসেছে, তারপর তাদের কেউ তুলতে এসেছে, তখন হকাররা গেছে শাসক পার্টির লোকাল নেতা বা কাউন্সিলরের কাছে; তারা বরাভয় দিয়েছে হয়ত, কিছু টাকা নিয়েছে বিনিময়ে, বা/এবং রাজনৈতিক আনুগত্য। তারপরেও যখন হকারকে তুলতে আসে, তখন হকারকেই দাঁড়াতে হয় নিজেকে। তারপরেও হকার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু এতকিছুর পরেও হকার উঠে যায়নি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

এসব থেকে শিক্ষা নিয়েই তৈরি হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হকার আইন। বা হকার নিয়মিত করণের আইন। হ্যাঁ, ২০১৪ সালে পাশ হওয়া আইনটির নামই তাই। ২০০৪ সালে প্রথম ইউপিএ সরকার এলে আইনটির জন্য সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল, এসেছিল জাতীয় হকার নীতি। নীতি এক জিনিস, আর তার বাস্তবায়ন আরেক জিনিস। ক্ষমতার বয়ানে বাস্তবায়ন হবার জন্য ফের পাঁচ বছর পর জাতীয় হকার নীতি আনা হয়। ২০১২ সালে আইনটির খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রীসভা। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের মেয়াদ শেষ হবার এক দেড় মাস আগে খোদ সোনিয়া গান্ধীর উদ্যোগে এই আইন পাশ হয় লোকসভা ও রাজ্যসভায়।

মাঝে ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট হকারিকে জীবিকা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে *। অর্থাৎ, এর আগে হকারি জীবিকা হিসেবে স্বীকৃত ছিল না। বলা যায়, রাস্তায় হকারি হল এমন একটি জীবিকা, যা নয়াউদারবাদ বা বিশ্বায়নের জমানায় গণমানুষের সৃজন। রাস্তায় হকারি বহুদিন থেকে আছে, কিন্তু বিশ্বায়নের জমানায় তাকে যাপন হিসেবে বেছে নেয় বহু লক্ষ মানুষ। ২০০৪ সাল থেকে তাকে 'নিয়মিতকরণ' বা ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তরের চেষ্টা শুরু হয়। ২০১৪ সালে সেই আইন তৈরি হয়।

তারপরেও সেই আইন রূপায়ণ করা যায়নি প্রায় কোথাওই ঠিকভাবে। কলকাতাতেও করা যায়নি। অর্থাৎ, বোঝাই যায়, ক্ষমতা হকারিকে নিজের বয়ানে বদলে নিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। হকারি কিন্তু টিঁকে গেছে এবং বহরে গতরে বাড়ছে। হকারের 'ফুটপাথ দখল' আটকাতে কলকাতার মেয়র চওড়া ফুটপাথগুলোকে গাছ লাগিয়ে ছোটো করে দিচ্ছে, যাতে তাদের দুইজন মানুষের বেশি পাশাপাশি হাঁটার জায়গা না থাকে; এবং বলাই বাহুল্য, হকার বসার জায়গা না থাকে। এটাকে অবশ্য মিডিয়া 'ফুটপাথ দখল' বলছে না এখনও। দেখা যাক।

হকারির সঙ্গে সক্ষমতার রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল নয়ের দশক এবং এই শতাব্দীর প্রথম দশকে। নয়ের দশকে প্রায় সমস্ত হকার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনগুলি মূল ধারার পার্টিগুলোকে প্রাধান্যে না রেখে গড়ে উঠেছিল কলকাতায়। সেগুলো জঙ্গীও ছিল অনেক। পরে কংগ্রেসের জঙ্গী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি হকার আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করে। কলকাতার হকার সংগঠনগুলির নেতাদের ওঠাবসা বেশি ছিল ছোটো ছোটো নকশাল গ্রুপগুলির সঙ্গে যারা উঠতে বসতে শাসক বামফ্রন্টের বাপান্ত করত।

হকারি সামগ্রিকভাবে জাগতিক পরিসরের বাসনা, তার (গণ) যাপনে রূপান্তর এবং সক্ষমতার রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। দুঃখের বিষয়, হকারি নিয়ে যাবতীয় আকাদেমিক গবেষণা হয় হকার নিয়মিতকরণ নিয়ে; তাকে রক্তমাংসের মানুষের বাসনা–যাপন–সক্ষমতা –র অক্ষে স্থাপন করে কোনও গবেষণা নেই। তবে হকারি নিয়ে ছোটো বড়ো পত্রিকার পরিসরে অনেক লেখালেখি আছে, প্রবন্ধ থেকে শুরু করে গল্প উপন্যাস, সব। সেসব ছেনে হকারি–কে বাসনা–যাপন–সক্ষমতার অক্ষে স্থাপন করা সম্ভব।

২০১৪ সালে ক্ষমতার অছি হবার পর ২০১৬ সালে নোটবন্দীর মধ্যে দিয়ে বিজেপি সরকার ফ্যাসিবাদের পালে হাওয়া দেয় এবং দেশে ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি তৈরি হয়। ২০২০ সালে করোনার মধ্যে দিয়ে সেই ফ্যাসিবাদী

---

*'গাইন্দা রাম এবং অন্যরা বনাম দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও অন্যরা, ৮ অক্টোবর ২০১০' - এই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে, হকার, স্কোয়াটার এবং ভেন্ডর–দের অধিকার মৌলিক অধিকারের ধারা ১৯(১)(জি) –তে স্বীকৃত। এই ধারায় রয়েছে - "to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business."

পরিস্থিতির অবসান হয়, কিন্তু তার মধ্যেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন দানা পেকে গিয়েছিল সারা ভারত জুড়ে। তিন কৃষিবিলের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন, এনআরসি সিএএ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি নানাকিছুর মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনতাও তৈরি হয়ে গেছিল।

তাদেরই একটা অংশ 'সংবিধান বাঁচাও আন্দোলন' তৈরি করেছিল*। সেই 'সংবিধান বাঁচাও আন্দোলন'-এর থেকে আসে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'-র ধারনা। সেখানে আসে রাহুল গান্ধী। এভাবেই সক্ষমতার রাজনীতির পরিসরের মধ্যে থেকে তৈরি হয় ক্ষমতার রাজনীতির প্রেক্ষাপট, তা আত্মসাৎ হয় ক্ষমতার রাজনীতিতে; এবং এতে সক্ষমতার রাজনীতির পূর্ণ সম্মতি ছিল; কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি এবং ফ্যাসিবাদী রাজনীতির মোকাবিলায় ক্ষমতার পরিসরের একটা (অফ্যাসিবাদী) অংশের সাথে জোট বাঁধার দরকার পড়েছিল। যে জোট পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল, 'নো-ভোট টু বিজেপি প্রচার' এর মাধ্যমে, তৃণমূলের সাথে। যদিও করোনা-উত্তর সময়ে ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি তখন আর নেই, তবুও ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতির স্মৃতি সক্ষমতার রাজনীতিকে এই জোটের দিকে নিয়ে গেছিল — ফ্যাসিবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে। ঠিক যেটা হয়েছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রার মধ্যেও।

ক্ষমতার পরিসরের এই রসদটি বুঝতে ভুল হয়নি, এবং এর মাধ্যমেই ক্ষমতার পরিসরের অফ্যাসিবাদী অংশটি তার রাজনীতি এবং জোট পুনর্গঠন করে। দু-দশক আগেকার ইউপিএ জোট ভেঙে যায়, তৈরি হয় ইন্ডিয়া জোট। একইভাবে দু-দশক আগেকার কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের বদলে তৈরি হয় ইন্ডিয়া জোটের নতুন কমন মিনিমাম এজেন্ডা।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের দেশে ক্ষমতার পরিসরের এইভাবে সক্ষমতার রাজনীতি থেকে রসদ, ইস্যু, রাজনীতি, এজেন্ডা, এমনকি সংগঠন অবদি তৈরি করা বা সক্ষমতার রাজনীতিকে আত্তিকরণ করার ইতিহাস অনেক পুরনো। হয়ত, 'ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্র' বলে ভারত রাষ্ট্রের যে সুনাম, তা ঠিক এই কারণেই। আর এই ব্যাপারে কংগ্রেসের জুড়ি নেই। খোদ কংগ্রেস দলটাই তৈরি হয়েছিল এইভাবে। তা ছিল সারা দেশের নানা জায়গায় উপনিবেশ বিরোধী যে আন্দোলনগুলি, সেগুলির সম্মেলন বা কংগ্রেস — যা উপনিবেশ-উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষমতার অছি হয়ে বসে।

তৃণমূলও ক্ষমতায় এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন সহ আরো নানা আন্দোলন-এর থেকে

---

*যেমন, নানা প্রান্তে ছোট ছোট ভাবে মিছিল ইত্যাদি সংগঠিত হবার পাশাপাশি ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে মুম্বই-তে অনুষ্ঠিত হয় 'save constitution, save nation' কনভেনশন।

রাজনীতি, ইস্যু, এজেন্ডা, ও সংগঠন সংগ্রহ বা আত্তিকরণ করে। তার আগে সিপিএম–ও ক্ষমতায় এসেছিল জরুরি অবস্থা বিরোধী বহু বিচিত্র আন্দোলন থেকে রাজনীতি, সংগঠন ইত্যাদি সংগ্রহ বা আত্তিকরণ করে।

জাগতিক পরিসরের বাসনা এবং সক্ষমতার রাজনীতি–র আত্তিকরণ ও তাকে ক্ষমতার বয়ানে বদলে নেওয়া নিয়ে ক্ষমতার রাজনীতির কোনও লুকোছাপা নেই, বরং তারা এটা করে গৌরবের সঙ্গে, দাপটের সঙ্গে। যেন বা জন পরিসর ও সক্ষমতার রাজনীতির কাজই হল ক্ষমতার রাজনীতিকে নিয়মিত পরিপুষ্ট করা; ক্ষমতার রাজনীতির বয়ানে আত্তিকৃত হতে না পারলে যেন বা সক্ষমতার রাজনীতির কোনও মানেই নেই। অনেক সময় সক্ষমতার রাজনীতির মধ্যেও থাকে এই আওয়াজ। উদাঃ – হকার আন্দোলনের সার্থকতাই যেন হকার আইন হওয়ার মধ্যে।

ক্ষমতার রাজনীতির এই রাজনীতির ব্যাপারে ‘মালিকানাসত্ত্ব’–র নানা উদাহরণ আছে, যেমন, ১১ বছর ধরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন আফস্পা–র বিরুদ্ধে অনশন আন্দোলন রত আইরম শর্মিলার কাছে গিয়ে মমতা বলেছিলেন (২৬ জানুয়ারি ২০১২), আপনি অনেক আন্দোলন করেছেন, এবার আমাদের করতে দিন*।

৫ শাসক নির্বাচনে রক্তমাংসের মানুষের অনুপ্রবেশ

ফলে ক্ষমতার তরফে রক্তমাংসের মানুষের কাছে একটা দায়িত্ব দেওয়া আছে, বা বলা ভালো, একটা দায়িত্বের প্রত্যাশা আছে। সেগুলি হল — ক) মানুষ বিক্ষোভ করবে এবং তা করবে তৎকালীন ক্ষমতার অছি–র তরফে, এমনকি ক্ষমতার স্তম্ভগুলির তরফে ব্যাপক দমনের মুখে দাঁড়িয়েও; খ) সে গঠনমূলক ও বড়োমাপের ইস্যুর জন্ম দেবে; গ) আন্দোলনের জন্ম দেবে; ঘ) সংগঠনের জন্ম দেবে; ঙ) রাজনীতিরও জন্ম দেবে; চ) সেগুলি ক্ষমতার রাজনীতিকে উপহার দেবে এবং সেই উপহার পেয়ে ক্ষমতার রাজনীতি বলবে, ধন্যবাদ, অনেক করেছেন, এবার আমাদের করতে দিন।

এসবের মধ্যে দিয়ে ক) ক্ষমতার অছির পরিবর্তন হবে, যেমন আমাদের এখানে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম জঙ্গলমহল –এর জনআন্দোলনের জের–এ তিন দশকের বাম শাসন হটে গেছিল; খ) আইনের রদবদল হবে বা নতুন আইন

---

*আনন্দবাজার থেকে প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের কলমে:

মমতা বললেন, অনেক লড়েছেন একা। এ বার, আমাদের যা করার করতে দিন। আপনাকেও বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে। হাল ধরতে হবে।

চানু বললেন, আমি নিজের কথা ভাবি না, আমার দাবির কী হবে?

মমতার জবাব, বিবেচনা করছি সব। শুধু বিবেচনা, চানু হতাশ।

সতর্ক মমতা সঙ্গে সঙ্গে কিমের হাত থেকে দলীয় ইস্তাহার টেনে নিয়ে মেলে ধরলেন শর্মিলার সামনে। এই দেখুন। ক্ষমতায় এলে, মানবাধিকার ভঙ্গকারী আইন তুলে ছাড়ব আমরা।

তৈরি হবে, যেমন কৃষি জমি অধিগ্রহণ বিরোধী লড়াইগুলির ফলে ব্রিটিশ আমলে জমি অধিগ্রহন আইন বাতিল হয়েছিল (২০১৩), অনেক স্পেশাল ইকনমিক জোন বাতিল হয়েছিল বা অতি সম্প্রতি তিনটি কৃষিবিল বাতিল হল (২০২১); গ) সর্বোচ্চ যেটা হতে পারে, ক্ষমতার ব্যবস্থাটারই পরিবর্তন হলো এবং নতুন সাংবিধানিক পরিষদ বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বসল। যদিও এটা চলতি ব্যবস্থাটার কাছে বেআইনি এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কিন্তু ঠিক এইটাকেই বলে বিপ্লব। নানা ধরনের বিপ্লব হয়, কোনওটি অভ্যুত্থানমূলক, কোনওটি দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে, আবার কোনওটি কেবল ব্যাপক জনমসাবেশের মধ্যে দিয়ে।

যেমন, নেপালে দু–দশক আগে রাজতন্ত্র হটিয়ে সাংবিধানিক গণতন্ত্র তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। আবার ওই সময়েই ভেনেজুয়েলায় চাভেজ জমানা তৈরি হয়েছিল সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে। সওয়া এক দশক আগে আরব দুনিয়ার কিছু দেশে ব্যাপক জনসমাবেশের মাধ্যমে আগের জমানা হটিয়ে নতুন জমানা তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় এরকম কিছু হবার সম্ভবনা দেখা গেছিল, কিন্তু আইনের রদবদল কিছু হয়েছে এবং ক্ষমতার অছি পরিবর্তন হয়েছে বটে; তবে নতুন জমানা বা নয়া সংবিধানের জন্ম হয়নি। আবার পাকিস্তানে এখন ঘটছে ক্ষমতার অছির হাতবদল, যেখানে সেনা বরাবরের মতো তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়; সেই নির্বাচনকে ব্যবহার করে সেনা–র রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে চাইছে জনতা, বিশেষতঃ কমবয়সীরা। তাদের প্রতিনিধি হল ইমরান খানের দল, যারা আগের বার সেনার মদতেই ক্ষমতার অছি হয়েছিল। ঘটনা হল, সেই ইমরান খানের দলকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সেনা এবং আদালত। কিন্তু তবুও সেই দল সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যায় ভোটে জিতেছে। ফলে বলাই যেতে পারে, পাকিস্তানের জনতা ক্ষমতার অছি নির্বাচনকে ব্যবহার একটা জমানা বা ব্যবস্থারই বদল ঘটাতে চাইছে। এগুলি সবই জনতার বা 'গঠনকারী ক্ষমতা'র ক্ষমতা গঠনের উদাহরন।[৩]

প্রশ্ন হল, মানুষ কেন ক্ষমতার দেওয়া এই দায়িত্বে নিজের 'রাজনৈতিক সক্রিয়তা'কে আবদ্ধ রাখবে? অতএব তা সে রাখে না। সে নানাভাবে রাজনৈতিক সক্রিয়তা তো দেখায়ই, যেমন নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে জমায়েত ইত্যাদি। আবার সেই নিজস্ব দাবিদাওয়া থেকে সে ভোটও দেয়। মোটেই ক্ষমতার বেঁধে দেওয়া দায়িত্বের মধ্যে সে নিজেকে বেঁধে রাখে না। নিজস্ব দাবিদাওয়া মানে ব্যক্তির দাবিদাওয়া নয়, মানুষ আসলে রক্তমাংসের মানুষ। ফলে সে তার যাপন থেকে উঠে আসা নানা পরিচিতি, অভাব–অভিযোগ এবং সীমাবদ্ধতা থেকে ভোট দেয়। আরো মজার ব্যাপার হল, এই নিজস্ব দাবি–দাওয়ার জায়গা থেকে সে ভোট বয়কট–ও করে। যেমন, বিদ্যুতের

দাবিতে ভোট বয়কট, পানীয় জলের দাবিতে ভোট বয়কট — ইত্যাদি। বা নোটায় ভোট দেয়। ইদানিং প্রায় প্রতিটি শাসক-নির্বাচনেই (অর্থাৎ বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে) 'নোটা' বা 'কোনও প্রতিনিধি নেই' তে ভোটদানের পরিমাণ প্রথম দুই-তিনটি পার্টির পরেই থাকে।

আর সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ক্ষমতার পরিসরের নানা পার্টি 'প্রতিশ্রুতি' দেয়। এই 'প্রতিশ্রুতি'র কি কোনও পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের দেশে? হ্যাঁ, ঘটেছে বা ঘটে চলেছে। প্রতিশ্রুতির একটা বড়ো বয়ান থাকত, এবং অসংখ্য স্থানীয় ও ছোটো বয়ান থাকত। আমরা প্রথমে বড়ো বয়ানের সূত্র ধরে দেশের সাধারণ নির্বাচনগুলির ফলাফলের একটি ওপর ওপর রেখাচিত্র টানি।

১৯৮৯ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল 'গরিবী হটাও'। বিরোধীদের তরফে বফর্স কেলেঙ্কারি বা দুর্নীতি। বলাই বাহুল্য, বিরোধীদের দাবি বেশিরভাগ সময়ই থাকে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সজীবকরণ — এই লাইনে। আর শাসকরা নানা জাতীয়তাবাদী ও অর্থনৈতিক সাফল্যের। 'ইন্ডিয়া শাইনিং' প্রচার করে ২০০৪ সালে বাজপেয়ী সরকার যখন হারল, তখন বিরোধীরা একশ' দিনের কাজ সহ নানা অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

২০০৪ সালের ভোটের পর বামপন্থীদের সাথে কংগ্রেসের সমঝোতা হয় এবং কংগ্রেসের জোট সরকার গঠিত হয় বামপন্থী ও সমাজবাদী এবং বহুজন সাংসদদের সমর্থনে। বামপন্থী, সমাজবাদী এবং বহুজন সাংসদদের মোট সংখ্যা ছিল ১১৮ (৫৪৪ জন মোট সাংসদ)। ফলে এই সরকার বেশ কিছু আইন কানুন তৈরি করে যেগুলি মানুষের পরিচিতি, অভাব-অভিযোগ এবং সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে। এর সঙ্গে ছিল বিশ্বায়নের ফলে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন। এই দুইয়ের অভিঘাতে স্বাধীনতার পর এতাবৎ উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে থাকা সামাজিক বর্গগুলিও এগোতে শুরু করে। মেয়েরা, মুসলিমরা, জনজাতিগুলি এবং পশ্চাদপদ জাত ও জাতিগুলির মানুষরা উচ্চশিক্ষা, পরিষেবা, চাকরি বাকরি ব্যবসা স্বনিযুক্তি ইত্যাদির অঙ্গনে ঢুকে পড়তে থাকে ব্যাপকভাবে। *

২০০৯ সালের ভোটে কংগ্রেস ফিরে এসেছিল বিপুলভাবে। এবং এই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়া জারি থাকে। ফলতঃ 'অন্য'দের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ারও একটি বাতাবরণ তৈরি হয়। একইসাথে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় ব্যাপকভাবে, সম্ভবতঃ একশ' দিনের কাজ এবং খাদ্যসুরক্ষা আইনের মধ্যে দিয়ে গ্রাম-শহরে শ্রমের বাজার কিছুটা চড়া হয়ে যাওয়ার কারণে (অর্থাৎ, সস্তা শ্রম অমিল হতে থাকার কারণে)।

*যেমন, বনাধিকার আইন (২০০৫) এর মধ্যে দিয়ে বনজ সম্পদের ওপর জনজাতিগুলির অধিকার আসে, খাদ্য সুরক্ষা আইন (২০০৫) এর মধ্যে দিয়ে গরীব পরিবারগুলি ২ টাকা কিলো দরে চাল পেতে শুরু করে রেশনে।

এই প্রতিক্রিয়ার বাতাবরণে ২০১৪ সালে বিজেপি এল দুর্নীতি এবং জিনিসপত্রের দাম — এই দুটি ইস্যু নিয়ে কথা বলে। টুজি, কয়লা এবং কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটে বিজেপি একটি বয়ান রচনা করেছিল — মূল্যবৃদ্ধির কারণ হল দুর্নীতি; দুর্নীতির টাকার বেশির ভাগ বিদেশে পাচার হয়ে গেছে; সেই কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে, এবং তার পরিমাণ নাকি এত যে তাতে প্রতিটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ করে টাকা দেওয়া যাবে। যদিও সে সব কিছুই হয়নি, কিন্তু নয়া সামাজিক গণমাধ্যমের সুচারু ব্যবহারের মাধ্যমে বিজেপি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে ভাষা দিয়ে দেয়। ফলে শাসকদের ভোটের প্রায় দশ–বারো শতাংশ চলে যায় বিরোধীদের দিকে যা প্রায় ২০ শতাংশের 'সুইং' তৈরি করে এবং বিজেপি ক্ষমতায় আসে।

২০১৯ সালে সরকার পরিবর্তন হয়নি। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর নোটবন্দী করে কালো টাকা উদ্ধারের নাটকীয় ঘোষণার মাধ্যমে একটি ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল দেশ জুড়ে।* প্রায় কোনও কালো টাকা উদ্ধার না হওয়া এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কোনও উন্নতি না হওয়ার দশায় যখন সরকার বেশ বেগতিক, তখন কাশ্মীরে একটি সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে নোটবন্দীর ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতিকে টেনে নিয়ে যায় সরকার, যার ফলশ্রুতিতে তারা বিপুলভাবে জিতে যায়।

যাই হোক, প্রতিশ্রুতির এই বড়ো বড়ো বয়ানগুলির সাথে সাথেই থাকত ছোটো এবং স্থানীয় স্তরে রাস্তা, বিদ্যুৎ, জলের বন্দোবস্ত — এসব। পরিভাষায়, যেগুলি সরকারি পরিকাঠামো নির্মাণেরই কাজ, কিন্তু করা হত যেন বা মানুষ চেয়েছে তাই দিচ্ছি — এভাবে।

ইদানিং এই ছোটো ও স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর প্রতিশ্রুতি এবং একশ' দিনের কাজ, হকার নিয়মিতকরণ আইন, খাদ্য সুরক্ষা আইন, বনাধিকার আইন ইত্যাদির মতো গঠনমূলক বা স্ট্রাকচারাল আইনের প্রতিশ্রুতি পেরিয়ে নতুন এক ধরনের যোজনা এবং 'বিনামূল্যে সরকারি পরিষেবা'র প্রতিশ্রুতি শুরু হয়েছে। আমরা এগুলিকে একসাথে 'ভাতা ও বিনামূল্য পরিষেবা' বলতে পারি। এই ব্যাপারে পথপ্রদর্শক সম্ভবতঃ তামিলনাড়ুর রাজনীতি। তবে আপ এবং তৃণমূল–ও পিছিয়ে নেই খুব। অর্থাৎ, মূলতঃ অবিজেপি

*আমাদের দেশে ঐতিহাসিকভাবেই অনেকগুলি অর্থনৈতিক সংগঠন চলে। কিছু সাদা, কিছু কালো, কিছু অর্ধেক কালো অর্ধেক সাদা। তার সবগুলিকে বিলোপ করে মূল রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াটা সংগঠিত করা হয়েছিল একটি ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি তৈরি করে। যদিও এর পরপরই ক্রিপটোকারেন্সি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ফের রাষ্ট্রস্বীকৃত অর্থনৈতিক সংগঠনের বাইরের অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি মাথা চাড়া দেওয়া শুরু করে।

অকংগ্রেসি সরকারগুলির হাত ধরে এগুলি শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি নানা নির্বাচনে (যেমন তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকে কংগ্রেস, পাঞ্জাবে আপ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ও মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার গঠনে) এই ধরনের প্রতিশ্রুতি মূল জায়গা নিয়ে নিয়েছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি ২০২২ সালে নির্বাচনের মুখে এই ধরনের প্রতিশ্রুতির সরাসরি বিরোধিতা করে এবং সুপ্রিম কোর্টে এগুলি নিষিদ্ধ করার পক্ষে সওয়াল করে। আর এগুলির সপক্ষে সওয়াল করে ডিএমকে, তৃণমূল এবং আপ। সুপ্রিম কোর্ট এগুলো নিষিদ্ধ করেনি।

বিজেপি–ও লাইন বদলে ফেলে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ধাঁচে লাডলি বহিন যোজনা চালু করে, যাতে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাকে মাসিক ১২৫০/– করে দেওয়া চালু করা হয়, কারণ, মেয়েদের মধ্যে কর্মসংস্থানের হার পুরুষদের তুলনায় প্রচুর কম হবার ফলে তৈরি হওয়া মেয়েদের অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা কাটানো। হাতে নাতে ফল পায় তারা। ২০২৩ এর নভেম্বরের ভোটে মহিলারা বিপুল হারে বিজেপিকে ভোট দেয় এবং বিজেপি ফের জিতে যায় সমস্ত ওপিনিয়ন পোল নস্যাৎ করে। কর্ণাটকে কয়েক মাস আগে এভাবেই জিতেছিল কংগ্রেস, বিজেপিকে হারিয়ে।

দেখা যাচ্ছে, শুধু আইনের প্রতিশ্রুতি এবং পরিকাঠামোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জেতা যাচ্ছে না, এসবের সাথে সাথেই প্রয়োজন পড়ছে নানা ধরনের 'ভাতা ও বিনামূল্য পরিষেবা'।

আমরা আপাততঃ সামনের সাধারণ নির্বাচনের ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এই ইস্যুগুলো ক্ষমতার পরিসরের পার্টিগুলির ম্যানিফেস্টো থেকে নেওয়া।

আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচনে কোনও আসন জেতা তো দূরস্থান, অংশগ্রহণ–ও কখনোই সাধারণ মানুষের আওতার মধ্যেকার বিষয় নয়। তাতে প্রচুর টাকা জমা রাখতে হয়। তাছাড়া এত লক্ষ লোক একটা সিটের জন্য ভোট দেয় সরাসরি, যে তাদের কাছে নিজের প্রচারটুকু নিয়ে পৌঁছনোর জন্যই প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন হয় যারা প্রচুর সময় দেবে, যা কখনোই সাধারণ মানুষের জাগতিক ও আটপৌরে সংগঠনের পক্ষে সম্ভবই নয়। প্রতিটি ক্ষমতার পরিসরের পার্টি সেই জন্য পেশাদার কর্মী পোষে এবং তাদের সংগঠনগুলিই একধরনের রোজগারের নেটওয়র্ক। ফলে আমাদের দেশের সাধারণ নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচন এইজন্যও অন্যান্য (পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটি, শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্রসংসদ) নির্বাচনের চেয়ে আলাদা। এছাড়াও আরেকটা পার্থক্য আছে, সেটা হল, শাসক বা রাষ্ট্রক্ষমতার অছি নির্বাচন এগুলো। ফলে সাধারণ নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনের 'ইস্যু' আমাদের ক্ষমতার

পরিসরের পার্টিগুলির ম্যানিফেস্টো থেকেই দেখতে হবে এবং বলাই বাহুল্য 'ইস্যু'গুলি ক্ষমতার বয়ানে, তা সে জনতার ইস্যু হোক বা রাষ্ট্রীয়/কর্পোরেট পুঁজির ইস্যু হোক।

জনতার ইস্যু (ক্ষমতার বয়ানে উপস্থাপিত) : সবার জন্য ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে, পরিবারের প্রধান মহিলার জন্য বা সব মহিলার জন্য ৮০০–২০০০/– করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভাতা, ৫০০/– করে গ্যাস সিলিন্ডার গরীব পরিবারগুলির জন্য বা মহিলাদের জন্য, কলেজ ছাত্রদের ফ্রি ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট, কন্যাশ্রী, কৃষকদের ন্যুনতম সহায়ক মূল্যের আইন, ২ লাখ টাকা অব্দি সুদবিহীন কৃষিঋণ, ৫ লাখ টাকা অব্দি সুদবিহীন ঋণ ছোটো ব্যবসায়ীদের, ১০ লাখ চাকরি, মাসে ১৫০০–৩০০০/– করে বেকার ভাতা, জাতভিত্তিক জনগণনা ও তার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সহ সমস্ত অনগ্রসর জাতের সংরক্ষণ, সংখ্যালঘুদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য নানা উৎসাহপ্রদান স্কিম, বছরে ১৫০ দিন পর্যন্ত একশ' দিনের কাজ, কৃষিঋণ মুকুব, কৃষক ভাতা, ধীবর ভাতা, মিস্ত্রী ভাতা, শিল্পী ও কলাকুশলী ভাতা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় ইস্যু বা কর্পোরেট পুঁজির ইস্যু : সিসিটিভি ক্যামেরা, কড়া শাস্তি, বিধান পরিষদ তৈরি, স্বাস্থ্য বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

এখানে ফের বলে রাখা দরকার। আমরা যেগুলিকে জনতার ইস্যু বলছি, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে 'জনতার ইস্যুর ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তরিত রূপ' বলা প্রয়োজন।

যেমন, কেউ বলে দেয়নি, ২০০ ইউনিট করে বিদ্যুৎ ফ্রি দিতে হবে। কিন্তু নিত্যদিন বিদ্যুতের দাম যেভাবে বেড়েছে, এবং বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে জীবনযাপনের আধুনিকীকরণের জন্য, তাতে তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া, আমাদের দেশে বিদ্যুতায়ন যত হচ্ছে, যত নতুন নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছচ্ছে, বিদ্যুৎ ব্যবহার সেই নতুন গ্রাহকদের কাছে একটা যাপনেরও পরিবর্তন সূচনা করছে। কিন্তু যদি বিদ্যুতের দাম বেশি হয়, তাহলে বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়ে পুরনো যাপনে (বা ভিন্ন বিদ্যুৎবিহীন যাপনে) ফিরে যাবার কথাও কেউ ভাবতে পারে। তা যাতে না হয়, সেই ভাবনাও আছে রাষ্ট্র ও কর্পোরেটের তরফে। উভয় দিক মিলে এই কিছু ইউনিট ফ্রি বিদ্যুৎ, যা আগে নতুন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য ছিল কিছু কিছু জায়গায়, বা কিছু পিছিয়ে পড়া জাতের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগে ছিল কিছু কিছু রাজ্যে। কিন্তু দিল্লি বা পাঞ্জাবের আপ সরকার প্রথম এই স্কিম সম্প্রসারিত করেছিল সবার জন্য।

সবার জন্য এই স্কিম হওয়ার ফলে স্কিমটির একটি গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। তা কেবল সমতার লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ হিসেবে না থেকে সর্বজনীন বিদ্যুৎ হিসেবে এসেছে, সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো

সর্বজনীন বিদ্যুতের অধিকারের ভিত্তি তৈরি হয়েছে*।

একইভাবে, মহিলারা আমাদের দেশে মূলতঃ রোজগারহীন বা খুব কম রোজগার করেন, ছেলেদের তুলনায়, তা জাতীয় নমুনা সমীক্ষাগুলিতে স্পষ্ট দেখা যায়। তাই বলে তারা কম খাটেন এরকম নয়, বরং পরিবারের ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিশ্রম তাদের করতে হয়, কারণ, সামাজিক নিয়ম বা রীতি হল — মেয়েরা ঘরের বেশিরভাগ কাজ করে, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ঘরদোর গোছানো পরিষ্কার রাখা বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করা ইত্যাদি। কিন্তু রোজগার না থাকার কারণে বা কম থাকার কারণে তারা নানাভাবে ন্যূনতম ব্যাপারেও নির্ভরশীল থাকেন পরিবারের রোজগেরে পুরুষের ওপর। তা ঘরোয়া হিংসার বা কর্তৃত্বের জমি তৈরি করে, এবং বলাই বাহুল্য আমাদের দেশে ঘরোয়া হিংসার শিকার মেয়েরা এবং কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ মহিলা স্বামীর হাতে মার খেয়েছেন কোনও না কোনও সময়। এই রোজগার বৈষম্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক। এছাড়া প্রাইভেট চাকরিতে মেয়েদের সম কাছে অসম বা কম বেতন দেওয়ার রেওয়াজ আছে এবং তা নানা সমীক্ষায় দেখা যায়।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, মেয়েদের মধ্যে পরিবারের পুরুষের চেয়ে পৃথক ও স্বাধীন অস্তিত্বের বাসনা বাড়ছে। কেন ছেলেদের চেয়ে তাদের রোজগার কম হবে বা ঘরের কাজ করার কোনও দাম নেই কেন, এইসব প্রশ্ন উঠছে। এই বাসনার যে খুব বাঙ্ময় প্রকাশ ছিল তা নয়। এই অসমতার নিদানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হল মেয়েদের হাতে কিছু মাসিক ভাতা তুলে দেওয়া — পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল চালু করেছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তা কংগ্রেসও চালু করেছে কর্ণাটক-এ। পশ্চিমবঙ্গে সবাই মাসে অন্ততঃ হাজার টাকা পায়, অনগ্রসর জাতি ও জনজাতির মেয়েরা আরো আড়াইশ' টাকা বেশি পায়। কংগ্রেস কর্ণাটকে চালু করেছে পরিবারের প্রধান মহিলার জন্য হাজার টাকা মাসে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার জন্য মাসে বারশ' পঞ্চাশ টাকা ভাতা চালু করে দিয়েছে ২০২৩ এর গোড়াতেই।

টাকার অঙ্ক নানারকম, কারা এই ভাতা পাবে তাও বিভিন্ন। তবে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার জন্য এই স্কিম থাকলে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে বা মধ্যপ্রদেশে আছে, তবে তা হয়ে যায় লিঙ্গসমতার দিকে রাষ্ট্রীয় প্রয়াস। প্রসঙ্গতঃ মেয়েদের দিক থেকে এই বাসনার (ন্যূনতম অর্থনৈতিক স্বাধীনতা) বাঙ্ময় প্রকাশ না

---

*যদিও অধিকারের যে কোনও বয়ানই ক্ষমতার বয়ান, ফলে তাতেও তা ক্ষমতার বয়ানের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। যেমন, একটি খুবই জঙ্গী অধিকারের বয়ান কল্পনা করা যাক। ধরা যাক, সংবিধানে লেখা হল, 'খিদে পেলে এবং পকেটে পয়সা না থাকলে মানুষের দোকান থেকে খাবার কেড়ে খাওয়ার অধিকার আছে'। এমনকি এই বয়ানটিও ক্ষমতার বয়ান। অধিকার দিচ্ছে রাষ্ট্র এবং অধিকার পাচ্ছে মানুষ। -- এই ব্যাপারে আমরা অন্যত্র অন্য কোনও দিন আলোচনা করব।

থাকলেও বাসনার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, যখন মেয়েরা বিপুলভাবে সমর্থন করে তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩ এর পঞ্চায়েত ভোটে এবং ২০২১ এর বিধানসভা ভোটে; এবং বিজেপিকে মধ্যপ্রদেশে ২০২৩ এ। তবে সেই বাসনার ক্ষমতার বয়ানে রূপান্তরিত যে রূপ (মাসে এত টাকা মাসিক ভাতা), তা মেয়েদের মধ্যে ছিল না নিশ্চয়, তাহলে এই নিয়ে বাঙ্ময়তাও থাকত।

আমরা দুটি উদাহরণ বিস্তৃত করলাম, বাকিগুলি নিয়েও এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

৬ সাধারণ নির্বাচনে সক্ষমতার রাজনীতি

'শাসক' নির্বাচনে রক্তমাংসের মানুষের বাসনাগুলি এইভাবে ঢুকে পড়ে। এগুলিকে ক্ষমতার পরিসর ব্যঙ্গ করে ডোল বলে, রেউড়ি বলে; বা হয়ত 'অনুগ্রহ' ভাবে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে শাসক নির্বাচন বা সাধারণ নির্বাচনের মতো ক্ষমতার রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো উৎসবের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে রক্তমাংসের মানুষ তথা জাগতিক পরিসর এবং সক্ষমতার রাজনীতির কাছে 'শাসক' নির্বাচনের মূল্য এইটাতে। সক্ষমতার রাজনীতি 'ভালো শাসক' চায় না, 'গণতান্ত্রিক শাসক' চায় না — শাসকের বাছবিচার তার লক্ষ্য নয়। সে চায় 'শাসক' নির্বাচনে রক্তমাংসের মানুষের বাসনার সম্প্রসারণ। সে চায় 'শাসক' নির্বাচনে জাগতিক পরিসরের সম্প্রসারণ। সাধারণ নির্বাচনে এইটুকুই সক্ষমতার রাজনীতি।

কীভাবে সাধারণ নির্বাচনে জাগতিক পরিসরের সম্প্রসারণের দাবি করতে পারা যায়? বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তিনটি উপায়ের কথা আমরা বলছি।

১) ভর্তুকি বা বিনামূল্য নয়, সর্বজনীন :

নানা রাজ্যে সরকারগুলি বা বিরোধীরা নানারকম ভর্তুকি ও বিনামূল্য পরিষেবা বা পণ্য–র ব্যবস্থা করছে। কোনওটিত উপকৃত হচ্ছে একটা অংশের মানুষ। কোনওটিতে উপকৃত হচ্ছে সবাই। যেমন, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে দু'শ বা তিনশ' ইউনিট অবদি বিল হয় যাদের, তাদের (গৃহস্থ ও ভাড়াটে)–কে বিনামূল্যে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে দিল্লির আপ সরকার, পঞ্জাবের আপ সরকার, কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার। ঝাড়খণ্ড সরকার একশ' ইউনিট অবদি যাদের বিদ্যুৎ বিল, তাদের বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও সরকারগুলি মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, এই দেখো, এই হল তোমাদের আসল বিদ্যুৎ বিল, আমরা এত টাকা মাসে তোমাদের ভর্তুকি দিলাম। একই রকম ব্যাপার নাকি পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলিতে, যেখানে কোনও পয়সা লাগে না, সেখানেও করার পরিকল্পনা হচ্ছে।

এই 'ভর্তুকি দিচ্ছি', 'বিনামূল্যে দিচ্ছি' বলে যে সরকারি বয়ান, যেন বা

মানুষকে উদ্ধার করে দিচ্ছে এসব দিয়ে, তার সঙ্গে তর্ক করবে সক্ষমতার রাজনীতি। শুধু বিদ্যুৎ এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্র নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মেয়েদের পিএইচডি পর্যন্ত টিউশন ফি লাগবে না। এখানেও বলা দরকার, শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নয়, সরকারি উচ্চশিক্ষাও সম্পূর্ণ অবৈতনিক হওয়া দরকার এবং তা লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে সবার জন্য। এবং একইসাথে, উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত পরিকাঠামোও থাকা প্রয়োজন। ভর্তুকি বা বিনামূল্য নয় — সর্বজনীন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রেশনে মাসে পাঁচ কেজি করে চাল গরীব পরিবারগুলিকে (বিপিএল কার্ড যাদের আছে) বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে। এটাও সর্বজনীন হওয়া উচিত, অর্থাৎ সবাই পাবে এরকম বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। কেউ না নিলে অন্য কথা। যেমন বিনামূল্যে বিদুৎ পরিষেবাও কেউ না নিতে পারে, সে যদি আবেদন না করে তাহলে পাবে না, সেরকম। এখন যেমন প্রায় ৮১ কোটি মানুষ বিনামূল্যে সরকারি চাল পায়, দেশের আনুমানিক ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে। কিন্তু সর্বত্র শোনা যায়, গরীব মানুষের বিপিএল কার্ড নেই। নানা সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে বিপিএল কার্ড করতে পারেনি। তারা কিন্তু এই বিনামূল্যে সরকারি চালের পরিষেবার অন্তর্গত হচ্ছে না। কেউ বলতে পারে, দুর্নীতি হবে সবাইকে দিলে, কারণ সবাই রেশন তুলবে না, সেক্ষেত্রে রেশন দোকানদার তা খোলাবাজারে বিক্রি করবে। সেটা কীভাবে আটকানো হবে, তা সরকারের মাথাব্যাথা। এখন ডিজিটাল যুগে নানাভাবে তা আটকানো সম্ভব। কিন্তু ন্যুনতম খাদ্যশস্য অবশ্যই সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন।

এবং শুধু খাদ্যশস্য নয়, প্রোটিন আসে ডাল থেকে, চাল থেকে আসে না। সেই কারণে পর্যাপ্ত ডালও সবাইকে বিনামূল্যে দেওয়া প্রয়োজন। রান্না করার জন্য বিদ্যুৎচালিত কুকিং প্যাড ও সেই কুকিং প্যাডে রান্না করার উপযুক্ত বাসন কোসন — সেগুলিও বিনামূল্যে দেওয়া প্রয়োজন সবাইকে।

এছাড়া দিনে অন্ততঃ বেশ কিছু জিবি করে হাইস্পিড ইন্টারনেট ডেটা ও মাসে অন্ততঃ কয়েকশ' কল বিনামূল্যে দেওয়া প্রয়োজন সবাইকে। এইখানে এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে, কতটা ডেটা বা কল বা বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া উচিত। কীভাবে তা ঠিক হবে? আমরা এখানে একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক করতে পারি। পরিবারপিছু কতটা ব্যবহার তার যদি কম-থেকে-বেশি একটা তালিকা তৈরি করা যায়, তাহলে কমের দিক থেকে নব্বই শতাংশ পরিবারের সর্বোচ্চ ব্যবহার কত তা সহজেই জানা যাবে, ইংরেজিতে যাকে বলে নাইন্টিয়েথ পার্সেন্টাইল। এই নব্বই শতাংশ ব্যবহারকারীর সর্বোচ্চ ব্যবহারের সমান ডেটা, কল, বা বিদ্যুৎ বিনামূল্য হওয়া প্রয়োজন। এটাকেই আমরা

বলতে পারি সর্বজনীন বিদ্যুৎ, সর্বজনীন ডেটা এবং সর্বজনীন টেলিফোন কল।

দিল্লির আপ সরকার এবং কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার মহিলাদের জন্য সরকারি বাস পরিষেবা বিনামূল্যে করেছে। এটাও লিঙ্গ নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ সবার জন্য। এবং এর সাথে স্থানীয় ট্রেন ও জলপথ পরিষেবাও বিনামূল্য হওয়া প্রয়োজন সবার জন্য। কেউ না নিতে চাইলে আবেদন করবে না। কিন্তু উচ্চ গুণমানের খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ও যোগাযোগ — এগুলি সর্বজনীন হবে — এটা সক্ষমতার রাজনীতির দাবি।

'শাসক' নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই দাবিগুলি চারিয়ে দেওয়া যতটা যাবে, ততটাই ক্ষমতার রাজনীতির রাজসূয় যজ্ঞে রক্তমাংসের মানুষ তথা জাগতিক পরিসর সম্প্রসারিত হবে।

২) সমতার দিকে এগনো:

লিঙ্গসমতার প্রশ্নে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জাতীয় প্রকল্প ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথা বলা প্রয়োজন, যাতে মেয়েরা কলেজে পড়লে প্রতিবছর বেশ কিছু টাকা (২৫ হাজারের আশেপাশে) স্কলারশিপ পায়। এর ফলে মেয়েদের কলেজে পড়ার হার আগের চেয়ে অনেকটা বেড়েছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের সংরক্ষণ লিঙ্গসমতার দিকে জরুরি পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, মেয়েদের জন্য নানা ভাতার ক্ষেত্রে কোনও বাছবিচার থাকা উচিত নয়, যেমন পরিবারের একজন মহিলা পাবে (কর্ণাটক), বা গরীব ঘরের মহিলারা শুধু পাবে (রাজস্থানে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ছিল) ইত্যাদি। মহিলারা সবাই পাবে, যার ইচ্ছে হবে না সে আবেদন করবে না। সব মহিলারা পাবার যোগ্য হলে তবেই কেবলমাত্র এগুলি লিঙ্গসমতার দিকে জরুরি পদক্ষেপ হতে পারে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশ করেছে।

জাতসমতার লক্ষ্যে তপশিলী জাতি ও জনজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতবর্গের জন্য কিছু সিট বরাদ্দ আছে উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকুরিতে। প্রাইভেটে সেসব কিছু নেই, সরকারি চাকরির পদোন্নতিতেও সেসব কিছু নেই। কোন জাতের জন্য কতটা সংরক্ষণ তার কোনও হিসেব নেই, জাতবর্গ ধরে আছে। তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে থাকা জাতের মানুষ কত তা ১৯৩১ সালের জনগণনার অনুযায়ী করা। তারপর ১৯৫১ এবং ২০১১ সালে জাতভিত্তিক জনগণনা হলেও তার ফল প্রকাশ হয়নি।

আমাদের দেশে দশমবার্ষিক জনগণনা ২০২১ সালে হবার কথা ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে, সম্ভবতঃ জাতভিত্তিক জনগণনা করার ভয়ে। জাতভিত্তিক জনগণনা করলে হিন্দুত্ববাদের বয়ান ভেস্তে যাবে — বোঝা যাবে হিন্দুদের মধ্যে এগিয়ে থাকা জাতের অবস্থা

যথেষ্ট ভালো হলেও পিছিয়ে থাকা জাতগুলির হাঁড়ির হাল। হিন্দুত্ববাদের স্লোগানে আড়াল হচ্ছে পিছিয়ে থাকা জাতগুলির অনুন্নয়ন, অসমতা। তাছাড়া, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি দাঁড়িয়েই রয়েছে অন্যদের 'মুসলিম-তোষণ' এ অভিযুক্ত করার ওপরে। জনগণনা হলেই তাতে মুসলিমদের অনুন্নত অবস্থাও সামনে চলে আসবে, তোষণের অভিযোগ টিঁকবে না। সম্ভবতঃ এইসব কারণেই জাতভিত্তিক জনগণনা দূরের কথা, সাধারণ জনগণনাটুকুও করতে চাইছে না মোদি সরকার; পাছে এই হিন্দু-ঐক্য ও মুসলিম-বিদ্বেষের রাজনীতির বয়ান ভেস্তে যায়।

কিন্তু জনগণনা এবং জাতভিত্তিক জনগণনা না হলে সমস্ত ধরনের অসমতার সত্যিকারের চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। তখন 'পারসেপশন'-এর ভিত্তিতে নানা অন্যায় দাবি উঠবে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে মারাঠা জাতের ওবিসি বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যে আদৌ তারা পশ্চাদপদ কি না। যদিও মারাঠাদের ওবিসি বর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আন্দোলন বেশ শক্তিশালী জনআন্দোলন। একই কথা বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে কুড়মিদের তপশিলি জনজাতি-র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অত্যন্ত শক্তিশালী জনআন্দোলন নিয়েও। জাতভিত্তিক জনগণনা ছাড়া বোঝাই সম্ভব নয় যে এই দাবিগুলি কতটা যৌক্তিক। একইসাথে জাতভিত্তিক জনগণনা এই আন্দোলনগুলিকেও একটি আয়না দিতে পারে।

সম্প্রতি বিহার সরকারের উদ্যোগে জাতভিত্তিক জনগণনা হয়েছে বিহারে। এটি একটি অভূতপূর্ব উদ্যোগ। তাতে দেখা গেছে, বিহারে ব্রাহ্মণ কায়স্ত ভূমিহার ইত্যাদি 'উঁচু' জাত বা এগিয়ে থাকা জাত বা জেনারেল কাস্ট -এর মোট জনসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার পনেরো শতাংশ। তপশিল ভুক্ত জাতিগুলির মানুষ প্রায় কুড়ি শতাংশ, আর জনজাতিগুলির মানুষ প্রায় দুই শতাংশ। অন্যান্য পিছিয়ে থাকা জাতিগুলির মোট মানুষ বিহারের জনসংখ্যার তেষট্টি শতাংশের মতো, যার মধ্যে ছত্রিশ শতাংশ অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত।

উন্নয়নের মাপকাঠিগুলিতে প্রত্যাশামতোই 'উঁচু' জাতগুলি বা জেনারেল-রা অনেক এগিয়ে। যেমন, রাজ্যে মোট জনসংখ্যার সাড়ে ছয় শতাংশ গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু জেনারেল কাস্টগুলির মধ্য গ্র্যাজুয়েটের হার সাড়ে চোদ্দ শতাংশ। সেখানে তপশিলি জাতিগুলির মধ্যে গ্র্যাজুয়েটের হার তিন শতাংশের মতো, জনজাতিগুলির মধ্যে সাড়ে তিন শতাংশের মতো, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতগুলির মধ্যে সাত শতাংশের মতো, এবং অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জাতগুলির মধ্যে সাড়ে চার শতাংশের মতো।

বিহারের জনসংখ্যার দেড় শতাংশের সামান্য একটু বেশি সরকারি চাকরি করে। কিন্তু জেনারেল কাস্টগুলির মধ্যে তিন শতাংশ সরকারি চাকুরিতে

আছে, আবার অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জাতগুলির মধ্যে সেই শতাংশ এক-এর-ও কম। একটু ভালো মানের প্রাইভেট চাকুরি করে বিহারের সওয়া এক শতাংশ মানুষ। কিন্তু জেনারেল কাস্টের সাড়ে তিন শতাংশ এই ভালো মানের প্রাইভেট চাকরিরত, আর তপশিলি জাতিগুলির মধ্যে মাত্র ০.৫১ শতাংশ এই ভালো মানের প্রাইভেট চাকরি করে বিহারে।

বিহার জাতভিত্তিক জনগণনার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, মুসলিমদের মধ্যে আটত্রিশটি জাত আছে। যার মধ্যে একত্রিশটি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জাতগুলির অন্তর্গত, চারটি অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতগুলির অন্তর্গত, এবং তিনটি জেনারেল কাস্ট বা 'উঁচু' জাতের অন্তর্গত।

বিহারে নীতিশ কুমার-লালু যাদবের সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এই জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশ করার পরেই সরকারি চাকরি ও শিক্ষাঙ্গনে সংরক্ষণ বাড়িয়ে পঁচাত্তর শতাংশে নিয়ে চলে যায়, যার মধ্যে দশ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক করে দেওয়া 'উঁচু'জাতের অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণ। বাদবাকি পঁয়ষট্টি শতাংশ জাতভিত্তিক সংরক্ষণ, আনুপাতিক জনসংখ্যার হার অনুযায়ী। যেমন আগে তপশিলি জাতিগুলির জন্য সংরক্ষণ ছিল ষোল শতাংশ, এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে কুড়ি শতাংশ; আগে তপশিলি জনজাতিগুলির জন্য সংরক্ষণ ছিল এক শতাংশ, এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই শতাংশ; আগে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতগুলির জন্য সংরক্ষণ ছিল বারো শতাংশ, এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে আঠারো শতাংশ; আগে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জাতগুলির জন্য সংরক্ষণ ছিল আঠারো শতাংশ, এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে পঁচিশ শতাংশ।

এবার একটা মজার কথা বলা যাক। এসব হয়ে যাওয়ার পর বিজেপির নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যার ওপর কিনা সারা দেশের দশমবার্ষিক জনগণনা করার দায়িত্ব ছিল এবং যা তিনি করে উঠতে পারেননি, তিনি বিহারে জনসভায় এসে বলেন, বিহারে জাত জনগণনায় মুসলিমদের সংখ্যা এবং যাদবদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। এই উক্তি নিয়ে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি মুচকি হেসে জবাব দেন, উনি কী করে জানলেন?

একথা ঠিকই যে উন্নয়নের সূচক হিসেবে সরকারি চাকরি বা ভালো মাইনের প্রাইভেট চাকরি যথেষ্ট নয়। বিহারে সামগ্রিক ভাবে মাত্র পৌনে তিন শতাংশ মানুষ সরকারি বা ভালো মাইনের প্রাইভেট চাকরি করে। আয়ের যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে জাতভিত্তিক জনগণনা থেকে, তাতে দেখা যাচ্ছে, বিহারে প্রায় চৌত্রিশ শতাংশ মানুষের বাড়ির মোট মাসিক আয় ছ' হাজার টাকার নিচে। প্রায় তিরিশ শতাংশ মানুষের বাড়ির মাসিক আয় ছয় থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে, এবং দশ থেকে কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে

আরো আঠারো শতাংশ মানুষের বাড়ির মোট মাসিক আয়। অর্থাৎ, বিহারে বিরাশি শতাংশ মানুষের বাড়ির মোট মাসিক উপার্জন কুড়ি হাজার টাকার নিচে।

যেহেতু সরকারি চাকুরি খুবই কম, তাই সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণ জাতসমতার ক্ষেত্রে খুব একটা কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। নানা শ্রমনিবিড় পেশায় স্বনিযুক্তদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা জাতসমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এবং বিহার মধ্যভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে খুব আলাদা কিছু নয়। ফলে মধ্যভারতের ক্ষেত্রে জাতভিত্তিক জনগণনায় পেশাসূচক, এবং নানা কম রোজগারের পেশায় যারা নিযুক্ত তাদের ভাতা ও অন্যান্য সহায়তা মধ্যভারতের সমাজের জাতসমতার দিকে যাবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার সেই রকম কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন, 'পিএম বিশ্বকর্মা' যোজনায় আঠারোটি পারিবারিক পেশায় নিযুক্তদের পনেরো হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এবং দৈনিক পাঁচশ টাকা স্টাইপেন্ডে পনেরো দিনের প্রশিক্ষণ, কম সুদে তিন লক্ষ টাকা অবদি ঋণ এবং বাজারের সুবিধা। কিন্তু তা একেবারেই কম। নানা পেশায় স্বনিযুক্তদের বাৎসরিক ভাতা প্রয়োজন, যেমন কৃষকদের ছ' হাজার টাকা ভাতার বন্দোবস্ত হয়েছে ২০২০–২১ সালের কৃষক আন্দোলনের পর থেকে, 'ন্যুনতম রোজগার সহায়তা' নামে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যজীবীদের জন্য বার্ষিক দশ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করেছে, বর্ষার দুই মাস যখন ধীবররা সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারে না, সেই সময়ে দেওয়া হবে। তবে এই পরিমাণগুলি খুবই কম। কোন স্বনিযুক্তি পেশায় নিযুক্তরা কত ভাতা পাবে, তা ঠিক হওয়া উচিত জাতজনগণনায় পেশাসূচক এবং পেশাগুলির গড় আয়ের ওপর নির্ভর করে। ওই পেশার নব্বই শতাংশের সর্বোচ্চ যে গড় মাসিক আয়, সেই আয়ের নিচে যারা আয় করে, তাদেরকে বিকল্প আংশিক সময়ের রোজগারের সুযোগ থেকে শুরু করে ভাতা — সবকিছুই দিতে হবে। তবেই তা কেবল জাতসমতার দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হবে।

সক্ষমতার রাজনীতির কাজ হল জাত জনগণনার পক্ষে সওয়াল করা। এবং এটাও বলা যে, সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ যথেষ্ট নয় জাতসমতার জন্য। প্রয়োজন পেশাভিত্তিক ভাতা, কৃষক ভাতা, ধীবর ভাতার মতো।

ভাষাগত অসমতার দিকটি সাধারণ জনগণনাতেই চলে আসে। জনগণনাতে অনেকসময় ভাষাভিত্তিক ভাবে নানা উন্নয়নসূচকগুলিকে দেখাও হয়। লিঙ্গ বা জাতের মতোই ভাষাগতভাবেও যদি অসমতার হদিশ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রেও সমতার জন্য নানা পদক্ষেপের দাবি সক্ষমতার রাজনীতির কাজ।

৩) 'শাসক নির্বাচন'–এর বয়ানকে প্রশ্ন করা :

আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, লোকসভা ও বিধানসভা ভোট হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসক নির্বাচনের মহাযজ্ঞ। যেভাবে তুলনায় ছোটো ছোটো পার্টিগুলি বা নির্দলদের ভোট কমছে, এবং কতিপয় সবচেয়ে বড়ো পার্টিগুলির মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে — তাতে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র'কে আদৌ টেঁকাতে সাহায্য করছে নাকি তা নির্বাচনী ব্যবস্থাটিকে 'প্রতিযোগিতামূলক রাজতন্ত্র'–র দিকে টানছে — তা নিয়ে আলোচনা হবার অবকাশ আছে।

সারা পৃথিবীতে এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনেক ধরনের আছে। আবার অনেক রাষ্ট্র আছে যারা গণতান্ত্রিক নয়, যেমন চীনের রাষ্ট্র। সবগুলিই পৃথক অনুসন্ধানের দাবি রাখে এবং তা এই লেখার মধ্যে করা সম্ভব নয়। আধুনিক রাষ্ট্রের 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র' থেকে 'প্রতিযোগিতামূলক রাজতন্ত্র'–র দিকে গতি শুধু ভারতবর্ষেই দেখা যাচ্ছে কি না, নাকি তা অন্যান্য দেশগুলিতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে; তার আলোচনা এবং কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমরা প্রস্তুত নই। কিন্তু এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষের আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি সেইদিকেই মদত দিয়ে চলেছে।

আগেই আলোচনা হয়েছে, আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা বা ক্ষমতা পৃথকীকৃত, যা আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য — আইন প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত সংসদ (অস্থায়ী), নিযুক্ত প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র (স্থায়ী), এবং নিযুক্ত বিচারব্যবস্থা (স্থায়ী)। এদের মধ্যে প্রথমটি সর্বোচ্চ, যদিও এই তিনটি শাখাই একান্ত নিজস্ব এক্তিয়ার আছে, যার মধ্যে অন্যেরা মাথা গলায় না। ইদানিং অভিযোগ উঠছে, প্রথম শাখাটি অন্য দুটি শাখার এক্তিয়ার ও কার্যকলাপকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে নানাভাবে। যেমন, অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণের রায় দেওয়া দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি গগোই অবসরের পর শাসক দলের হয়ে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন।

কাগজের ব্যালটের বদলে ইভিএম দিয়ে নির্বাচন হওয়ায় নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা কমেছে, ফলে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; কারণ নির্বাচন কমিশন চাইলে ইভিএম যন্ত্রের কারসাজি করতে পারে, কেউ ধরতে পারবে না; ব্যালটের সময় তা করা যেত না। সে কারণে নির্বাচন পরিচালনার কমিশন এবং তার প্রধান কারা হবেন, তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের বদলে তিনজনের একটি প্যানেল ঠিক করেছিল কমিশন মনোনয়নের জন্য, যেখানে তিনজন সদস্য থাকবে — প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং প্রধান বিচারপতি। কিন্তু নতুন আইন করে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে; এখন এই প্যানেলে থাকে প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর ঠিক করা একজন মন্ত্রী, এবং লোকসভার বিরোধী

দলনেতা।

রাজ্য এবং কেন্দ্রের শাসক দল বাদে অন্য দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শাসক বা বিরোধী দলে চলে যাচ্ছে দলবদল করে।

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশের গণতন্ত্রে আরেকটি মাত্রা আছে, তা হল আলাদা নির্বাচকমন্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচিত আলাদা রাষ্ট্রব্যবস্থা — কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার। শুধু নির্বাচিত আইনপ্রণয়নকারীদের সভাটাই আলাদা নয়, এমনকি বাকি দুই শাখাও আলাদা। আলাদা প্রশাসন, আলাদা বিচারব্যবস্থা। এবং কোথাও কোথাও স্বায়ত্বশাসনের পরিষদ, যেমন আমাদের রাজ্যেই আছে গোর্খা টেরিটরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। যদিও এগুলির মধ্যে পারস্পরিকতা আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বোচ্চ, তবুও এখানেও এক ধরনের ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং এক্তিয়ারের সীমানা আছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, সেই এক্তিয়ারেও হাত পড়ছে। পরিভাষায় এই ফেডারেল ব্যবস্থা ঝুঁকে যাচ্ছে কেন্দ্রের দিকে, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে।

এইগুলি একসাথে করলে যে গতিটি দেখতে পাওয়া যায়, তার কথা আমরা আগেই বলেছি — 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র' থেকে 'প্রতিযোগিতামূলক রাজতন্ত্র'-র দিকে যাওয়া।

সক্ষমতার রাজনীতির কাজ হল, এই 'শাসক নির্বাচন'-এর যে বাচন প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করা — কেন যে জিততে পারবে তাকেই আমরা ভোট দেব বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে? কেন যারা হারবে জানি, কিন্তু আমার পছন্দসই প্রার্থী, তাকেই ভোট দেব না? কেন আমরা এমএলএ বা এমপি সিটে কারা কারা দাঁড়িয়েছে তা দেখে ভোট না দিয়ে হবু শাসকের চিহ্ন দেখে ভোট দেব? কেন আমরা শাসক বা হবু শাসকের প্রার্থী বলে সেলিব্রিটিদের ভোট দেব যারা ভোটে দাঁড়ানোর আগে কোনওদিন রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্যতম সক্রিয়তাও দেখায়নি?

ক্ষমতার পরিসরের সংহতকরণ, বাড়বৃদ্ধি, রক্তমাংসের মানুষের জাগতিক পরিসরের তুলনায় তার বিরাটাকার হয়ে ওঠা — এইসব প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করা অবশ্যই সক্ষমতার রাজনীতির কাজ। এভাবেও রক্তমাংসের মানুষ এবং জাগতিক পরিসর 'সাধারণ নির্বাচন' নামক ক্ষমতার রাজনীতির উৎসবের মধ্যে সম্প্রসারিত হতে পারে।

ক্ষমতার পৃথকীকরণের কারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কতটা গণতান্ত্রিক তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমালোচনা আমরা আগেই করেছি — যে, তা রক্তমাংসের মানুষকে ''গণ'-তে সংকুচিত করে তাকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহার করে নিজেকে পুনরুৎপাদন করার জন্য। সক্ষমতার রাজনীতি যেহেতু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থারও সমালোচনা করে, তাই সে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি দিক নিয়ে এবং তার বদল নিয়ে

প্রকাশ্যে আলোচনা সমালোচনা করবে — এবং তা করবে গণতন্ত্রের চলতি ব্যবস্থা বা গণতন্ত্রের অন্য কোনও ব্যবস্থার প্রতি কোনও রকম মায়ামমতা না রেখেই।

শাসনব্যবস্থা কেমন হতে পারে, তা এখন কেমন, মানুষ কি অদূর ভবিষ্যতে শাসনব্যবস্থাবিহীন স্বয়ংচালিতভাবে হয়ে যেতে পারে — এই সব কিছুই ক্ষমতার গঠনের এই রাজসূয় যজ্ঞের মুহূর্তে সক্ষমতার রাজনীতির আলাপ আলোচনার বিষয়।

সোজা কথায়, রাষ্ট্রকে দুর্বল করা এবং দুর্বল রাখা সক্ষমতার রাজনীতি তথা জনতার রাজনীতির একটি অন্যতম কাজ। দুর্বল রাষ্ট্র জনগণের কথা কানে নিতে বাধ্য হয়, সবল রাষ্ট্র জনগণের ঘাড় মটকায়।

৭ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পুঁজিবাদের সীমানা

আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ কয়েকবছর ধরেই ভালো নয়, সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদের অবস্থাও ভালো নয়। ২০০৮ সালে আমেরিকার ধারের অর্থনীতির বুদবুদ ফেটে গিয়ে যে সঙ্কট শুরু হয়েছিল, তা থেকে বস্তুতঃ আর কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেনি পুঁজিবাদ।

সম্পদ বৃদ্ধির হার পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাস্থ্যের সবথেকে বড়ো পরিচয়। আমাদের দেশে বৃদ্ধির হার বেড়েছিল ২০০৪ থেকে ২০১৫ অবদি, বিশ্বায়নের যে সময়ে সম্পদবৃদ্ধি ঘটেছিল আমাদের দেশে; তা নিম্নগামী তার পর থেকেই। করোনা অতিমারীর বছরে সম্পদহ্রাস ঘটেছিল, কিন্তু তার পরের দু'বছরের বৃদ্ধির গড় নিলে দেখা যাবে, সম্পদবৃদ্ধির হারের নিম্নগামী দশা একইরকম আছে। অর্থাৎ করোনা অতিমারি জনিত লকডাউন আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে নতুন করে আর বেহাল করতে পারেনি।

সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেও ২০০৩–৪ থেকে একটি সম্পদবৃদ্ধির হারের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যা ২০১০ এর পর থেকে কমতে শুরু করে এবং অতি দ্রুত তা ২০০৩–৪ এর আগের সময়ের সমান হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বলা যেতে পারে, ২০০৪ থেকে ২০১৪ এই দশ বছর বর্ধিত হারে সম্পদবৃদ্ধিটুকুই বিশ্বকে বিশ্বায়নের দান। ২০১৪ সাল থেকে আমাদের দেশ–ও সারা পৃথিবীর মতোই বিশ্বায়ন–উত্তর অর্থনৈতিক জমানায় প্রবেশ করেছে। মোট সম্পদকে এখন মোট আয় বলা হয় — তাই বলতে পারা যায় যে, পৃথিবীর মোট আয় খুব সামান্য হারে বাড়ছে এই নয়া অর্থনৈতিক জমানায়।

এবার আসা যাক ধারের হিসেবে। পৃথিবীর মোট আয়ের চেয়ে মোট ধার প্রায় আড়াই গুণ, তা বেড়েই চলেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধার এবং আয়ের সম্পর্ক কী? একজন ব্যক্তি মানুষের ধার এবং আয়ের সম্পর্কের

চেয়ে তা আলাদা কিছু নয়। একজন ব্যক্তি মানুষ যখন ধার করে এবং বলে যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তা শোধ করবে, তার থেকে বোঝা যায়, সে আশা করে আগামী কয়েক মাসে তার আয় বাড়বে এবং ওই ধার শোধ করার পরও সেই আয়ের যেটুকু তার কাছে থাকবে তাতে তার চলে যাবে।

সেরকমই পুঁজিবাদী ম্যাক্রো অর্থনীতিতেও ধার হল আগামীতে বাড়তি আয়ের আশা, এবং মোটিভ–ও বটে। কে না জানে, পুঁজিবাদ দাঁড়িয়েই রয়েছে আগাম বা অগ্রিম–এর ওপর; আগে কারখানায় মাল তৈরি হয়, তারপর বিক্রি হয়; কতটা বিক্রি হবে তা নিশ্চিত জেনে সেই মতো মাল তৈরি করা আর যাই হোক পুঁজিবাদী কায়দা নয়। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে মোট ধার যদি আয়ের তুলনায় বাড়তেই থাকে (যেটা হচ্ছে) তাহলে বোঝা যায়, ওই ধার তামাদি হতে বসেছে বা দান–এ পর্যবসিত হতে বসেছে। সামগ্রিকভাবে ধার আয়ের চেয়ে বেশি হওয়া এবং এই অনুপাত বেড়েই চলার মানে হল, পুঁজিবাদের প্রত্যাশিত হার–এ আয়বৃদ্ধি ঘটছে না। এটাও পুঁজিবাদের ভগ্নস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে, সাধারণ নির্বাচনে রক্তমাংসের মানুষের বাসনার সম্প্রসারণ বা জাগতিক পরিসরের সম্প্রসারণের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আমরা কি দেশের অর্থনীতির অবস্থা খারাপ করে দিতে চলেছি? আমাদের দেশে মোট ধার ও মোট আয়ের অনুপাত প্রায় নব্বই শতাংশের মতো, যা সত্তর শতাংশের বেশি থাকলেই ভালো কিছু নয় বলে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন। এত 'ভাতা ও পরিষেবা' প্রকল্পের মাধ্যমে কি সরকারের খরচ বেড়েই চলবে না? এবং তার মাধ্যমে কি তার ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলবে না?

এইভাবে একসময় কি ভারতের অবস্থা গত দশকের গ্রীস বা এই দশকের শ্রীলঙ্কার মতো হয়ে উঠবে না, যখন ধার এত হয়ে যাবে যে তার সুদ দিতে গিয়েই আবার ধার নিতে হবে এবং একসময় আর ধারগুলো শোধ দেবার পরিস্থিতি থাকবে না; এবং তখন আর ধারও পাওয়া যাবে না, উপরন্তু ধার শোধ দিতে না পারার জন্য বিদেশি লগ্নি বন্ধ হওয়া থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়া — এরকম নানা কিছু হতে পারে? তা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে না কি? বা ধার যত বাড়বে তত বিদেশী ঋণদানকারী সংস্থা ও দেশগুলির শর্তাধীন হয়ে থাকতে হবে, যা হয়ত সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারে?

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, আধুনিক অর্থনীতির গবেষণা দেখায়, সরকার যদি জনগণকে টাকা দেয়, তাহলে জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কমে যায় না, বাড়ে — কারণ, সেই টাকা বাজারে 'রোল' করে। ফলে অর্থনীতির মূল ধারার মধ্যে থেকেই জনগণের পেছনে সরকারি খরচ বাড়ানোর কথা বলা

হচ্ছে। নয়াউদারবাদ, যা জনগণের পেছনে সরকারি খরচ কমানোর কথা বলে — ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বয়ানগুলির মধ্যেই তা আর বিকল্পহীন বয়ান নয়। গত দশকে এই বদলটি ঘটেছে।

তাছাড়া, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত কিছু কিছু দেশের ধার মোট আয়ের চেয়ে বেশি, যেমন আমেরিকা বা ফ্রান্স। এছাড়া সরকার প্রচুর টাকা খরচ করে পুঁজিপতিদের ঋণ মুকুব করে দেওয়ার মাধ্যমে; কর ছাড়ের মাধ্যমে; অস্ত্র শস্ত্র কেনার মাধ্যমে। সক্ষমতার রাজনীতি যখন সাধারণ নির্বাচনে জনগণের পরিসরের সম্প্রসারণের কথা বলে; তখন সে পুঁজিপতিদের ঋণ মুকুব না করে, ধনীদের ওপর সম্পত্তি কর বসিয়ে, স্বচ্ছলদের কর ছাড় না দিয়ে, এবং কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়িয়ে সেই টাকা জনগণের পকেটে যাতে যায়, তার কথা বলে।

আমাদের দেশে করকাঠামোয় দুই ধরনের কর আছে — প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করগুলির মধ্যে আছে কর্পোরেট ট্যাক্স, আয়কর ইত্যাদি। আর পরোক্ষ কর হল জিএসটি, এক্সাইজ ডিউটি, কাস্টম ডিউটি ইত্যাদি, যার মধ্যে জিএসটিই সিংহভাগ। প্রত্যক্ষ করের আওতাধীন কেবল সম্পদশালী, কর্পোরেট এবং স্বচ্ছল যারা। কিন্তু পরোক্ষ করের আওতাধীন সবাই — যেহেতু সবাই পণ্য ও পরিষেবা কেনে।

২০২২–২৩ সালে মোট জিএসটি সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১৮ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০১৭–১৮ সালে ছিল ৭ লক্ষ কোটি। অর্থাৎ পাঁচ বছরে বেড়েছে আড়াই গুণেরও বেশি। অপরপক্ষে ২০২২–২৩ সালে মোট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১৯ লক্ষ কোটি টাকার মতো, যা ২০১৭–১৮ সালে ছিল ১০ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পাঁচ বছরে বেড়েছে দুইগুণের কম। এই যে প্রত্যক্ষ করের বদলে পরোক্ষ করের পরিমাণ বেড়ে চলতে থাকা — এটা দেখায় যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের পকেট কেটে অতিধনী, ধনী এবং স্বচ্ছলদের পকেট ভরছে।

পণ্যপিছু গড়ে দশ শতাংশ হারে জিএসটি ধরলে আমাদের দেশে দারিদ্রসীমায় থাকা পরিবারগুলিও (মাসিক ব্যায় ছ' হাজার টাকা বা তার কম) বছরে সাত হাজার টাকা করে জিএসটি কর দেয় সরকারকে, যা তার একমাসের আয়ের চেয়ে বেশি।

আন্তর্জাতিকভাবে একটা জন–আন্দোলন আছে, বৈদেশিক ঋণ মুকুব–এর জন্য। বৈদেশিক ঋণের দুটি সূত্র থাকে সাধারণতঃ — ধনী দেশ এবং আর্থিক সংস্থা বা প্রাইভেট ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক ঋণ মুকুব করার দাবি ও আন্দোলন আমরা দেখেছিলাম — গ্রীস যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে নেওয়া ঋণ মুকুব ও নতুন ঋণের শর্ত নিয়ে ইউরোপিয়ান বড়ো ঋণদাতা দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দরকষাকষি করছিল, অর্থমন্ত্রী ইয়ানিস ভারুফাকিসের

নেতৃত্বে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা আছে এবং সেই সব অসমতার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই উপনিবেশের ইতিহাস, লুন্ঠন, যুদ্ধ ইত্যাদি। তাই অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলি থেকে ঋণ নিয়ে সেগুলো শোধ না দেওয়া, বড়ো আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে শোধ না দেওয়া — এসবের মধ্যে কোনও অন্যায় নেই।

অসমতার আরেকটি মাপকাঠি হল, মোট আয়ের কতটা পুঁজি থেকে আর কতটা শ্রম থেকে; যেখানে পুঁজি থেকে আয় বৃদ্ধি হল পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ অসমতা বৃদ্ধি এবং শ্রম থেকে আয়ের বৃদ্ধি মানে হল পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ অসমতা হ্রাস। পৃথিবীর হিসেব নিলে দেখা যাবে, শ্রম থেকে আয় এর তুলনায় পুঁজি থেকে আয় (অর্থাৎ, পুঁজির সুদ থেকে আয়) এর পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে আজ বেশ কয়েক দশক ধরে।

একটা উদাহরন দেওয়া যাক। যেমন, আমাদের দেশের অন্যতম বড়ো কর্পোরেট সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এর ব্যালেন্স শিট–এ দেখা যায়, সংস্থাটির মোট বার্ষিক লাভ পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকার মতো। আর কোম্পানিটি তার শ্রমিক–কর্মচারীদের পেছনে বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচ করে। অর্থাৎ, কেবল লাভেরই দশ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এর বাস্তুতন্ত্রে পুঁজি থেকে আয় শ্রম থেকে আয়ের দশ গুণ। এই সংস্থাটি তার লগ্নিকারীদের বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি লভ্যাংশ দেয়। অর্থাৎ, কোম্পানির বার্ষিক প্রদেয় লভ্যাংশ তার শ্রমিক–কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের প্রায় কাছাকাছি।

কর্পোরেট ক্ষেত্রে যেমন পুঁজি থেকে আয় শ্রম থেকে আয়ের দশগুণ; ঠিক তেমনি বেশ কিছু শ্রমনিবিড় ক্ষেত্র আছে, যেখানে পুঁজি থেকে আয় শ্রম থেকে আয়ের সমান বা তার কম, যেমন আমাদের রাজ্যে ছোটো কৃষিক্ষেত্র। ফলে কর্পোরেট ক্ষেত্রে পুঁজি থেকে যে বিপুল আয়, তার বেশিরভাগটা যদি সমাজের সর্বজনীন ক্ষেত্রে (সকলের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি) ব্যায় না হয়, তাহলে তা পুঁজির ক্ষমতাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়।

স্বনিযুক্তির আয় এই শ্রমের আয় এবং পুঁজির আয়ের হিসেবের মধ্যে কীভাবে পড়বে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু সেই সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করার পরেও দেখা যায়, অন্ততঃ ১৯৯০ সাল থেকে পুঁজির আয় বাড়ছে সমস্ত দেশেই। যা সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলিতে আরো বেশি পুঁজিভবনকেই দেখায়; এবং রক্তমাংসের মানুষ, যে কিনা শ্রমের মূর্ত রূপ, তার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বহীনতাকেই দেখায় — সমস্ত দেশে। সক্ষমতার রাজনীতির কাছে বাকি সব বয়ান (যেমন বৈদেশিক ঋণ বেড়ে যাবে, সরকারের খরচ

বেড়ে যাবে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ভালো মন্দ ইত্যাদি) এই বয়ানের তুলনায় কম গুরুত্বের।।*

*এই বয়ানের সঙ্গে মানানসই 'অষ্টাদশ লোকসভার প্রতি জনসাধারণের নির্দেশমালা' https://japonbad.in এ পাওয়া যাবে।

টীকা ও টিপ্পনি

১. পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। সেই বিপ্লবের প্রবাদপ্রতিম নেতা লেনিন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে বিপ্লব হবার মাস দেড়েকের মধ্যে, ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লিখেছিলেন প্রবন্ধ -- কীভাবে প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে হবে?। সে প্রবন্ধ শুরুই হল প্রতিযোগিতা যে পুঁজিবাদের ব্যাপার নয়, সেটা বলে :

> "বুর্জোয়া লেখকরা দিস্তা দিস্তা পাতা খরচ করে প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি উদ্যোগ, এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিপতিদের চমৎকার গুণাবলী ও আশির্বাদগুলির কথা বলে। সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে তারা এইসব গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে না, 'মানব প্রকৃতি'কে অবহেলা করে। যদিও বাস্তবতঃ পুঁজিবাদ বহু আগে ছোটো, স্বাধীন পণ্য উৎপাদন -- যা উদ্যোগ, শক্তি এবং সাহসী সূচনাগুলির অনেকটা পরিমাণ বিকাশ ঘটাতো, সেগুলিকে প্রতিস্থাপিত করেছে বড়ো এবং খুব বড়ো কারখানা উৎপাদন, জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি, সিন্ডিকেট এবং অন্যান্য একচেটিয়া দিয়ে। এই ধরনের পুঁজিবাদের পাল্লায় পড়ে প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমজনতার, নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের, একশ' জনের মধ্যে নিরানব্বই জন কঠোর পরিশ্রমীর উদ্যোগ, শক্তি এবং শাহসী সূচনাগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে মাড়িয়ে দেওয়া। প্রতিযোগিতা প্রতিস্থাপিত হয়েছে অর্থনৈতিক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, এবং সমাজের উঁচুতলার তৈলমর্দন দিয়ে।
>
> "প্রতিযোগিতা দূর করার বদলে সমাজতন্ত্র এই প্রথমবারের জন্য প্রতিযোগিতাকে করে তুলতে চায় সত্যিকারের সুবিস্তৃত, সত্যিকারের গণ পরিমাপের, মেহনতী মানুষের অধিকাংশকে শ্রমের আঙিনায় টেনে আনার জন্য যেখানে তারা দেখাতে পারবে যে তারা কী পারে, বিকশিত করতে পারবে তাদের সক্ষমতাগুলিকে, এবং সেইসব মেধাগুলি প্রকাশিত হবে, যা মানুষের মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পুঁজিবাদ দাবিয়ে রেখেছিল, ধ্বংস করেছিল এবং শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল।
>
> "এখন একটি সমাজতন্ত্রী সরকার ক্ষমতায় এবং আমাদের কাজ হল প্রতিযোগিতাকে সংগঠিত করা।"

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বা সোভিয়েত সংগঠনের একনায়কত্বের রাষ্ট্র গঠন করার এক দেড় মাসের মধ্যে কেন এটা লিখতে হচ্ছে? কারণ, ওই প্রবন্ধেই লেনিন লিখছেন, শ্রমিক এবং কৃষকরা এখনও নিস্তেজ। তারাই যে এখন শাসকশ্রেণী, সে সম্পর্কে তারা এখনও ওয়াকিবহাল নয়। এভাবে চলবে না। ইন্টেলেকচুয়াল এবং শিক্ষিতরা পরামর্শ দেয় খুব চমৎকার, এবং সে কারণে শ্রমিক কৃষকরা তাদের শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু তারা সেই পরামর্শগুলিকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে, বাস্তবায়ন সংগঠিত করার ব্যাপারে অতি জঘণ্য সেটা সবাই জানে। এখানে এই পরামর্শ বাস্তবায়ন সংগঠিত করার মতো লোক উঠে আসতে হবে শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে থেকেই।

ইন্টেলেকচুয়ালদের দিয়ে বাস্তবায়ন হবে না, কারণ তারা নিজেদের পরামর্শ এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে বড়ো বেশি ঘ্যাম নেয়। "শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার বাস্তব সংগঠকদের ভেতরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে"। ঐতিহাসিক ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে যখন তত্ত্বকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে প্রয়োগে, তাকে জীবন্ত করা হচ্ছে প্রয়োগ দিয়ে, তাকে সংশোধন করা হচ্ছে প্রয়োগ দিয়ে, তার পরীক্ষা হচ্ছে প্রয়োগের মাধ্যমে। মার্ক্সই তো বলে গেছেন, 'বাস্তব আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপ ডজনখানেক কর্মসূচীর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ'। কারণ, 'বন্ধু হে, তত্ত্ব হল ধূসর, আর জীবনের অনন্ত বৃক্ষটি সবুজ'। লেনিন প্রবন্ধটি শেষ করছেন প্রতিযোগিতার কিছু লক্ষ্য রেখে -- কারা শ্রমের উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি বাড়াতে পারল, কারা গরীবদের জন্য নতুন ভালো বাড়ি বানিয়ে দিতে পারল, কারা গরীবদের মধ্যে ধনীদের বাড়িগুলি বিলিয়ে দিতে পারল, কারা গরীব পরিবারগুলিতে প্রতিটি বাচ্চার জন্য প্রতিদিন একটা করে দুধের বোতল দিতে পারল? এসবের ওপর হবে প্রতিযোগিতা -- কমিউনগুলির মধ্যে, সোভিয়েতগুলির মধ্যে, অ্যাসোসিয়েশনগুলির মধ্যে।

সমাজতন্ত্রের পরিভাষায় বললে, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে গতি আনার জন্য, তাকে তলা থেকে সংগঠিত করার জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন। 'নিস্তেজ' শ্রমিক এবং কৃষকরা নইলে 'নিয়ন্ত্রক' হতে পারবে না। "আমাদের অবশ্যই তাদের সাংগঠনিক মেধার উত্থান ঘটাতে হবে, এই মেধা তাদের মধ্যেই খুঁজে বার করতে হবে; তাদের মধ্যে থেকেই সংগঠিত করা দরকার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা, সাংগঠনিক অর্জনের।" এই মেধাবী সংগঠকদের প্রশাসনে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানানো হবে জনগণের মধ্যেকার মেধাবী সংগঠকদের দিয়ে, যারা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মকাণ্ডের আন্তঃসাংগঠনিক প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে। এই কথাগুলো বলার সময় লেনিন প্যারি কমিউনের উদাহরণ দিতে ভোলেননি।

"কীভাবে উদ্যোগ, স্বাধীনতা, মুক্ত কর্মকাণ্ড এবং নিচু থেকে উদ্যমের সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক কেন্দ্রিকতা যা সমস্ত গতবাঁধা রূপের বাঁধন থেকে মুক্ত, একসাথে করা যায় তার মহতী উদাহরণ প্যারি কমিউন। আমাদের সোভিয়েত সেই একই রাস্তা ধরে চলতে চায়। কিন্তু তারা এখনও 'নিস্তেজ' "।

এখানে দুটো সহজ প্রশ্ন করে ফেলা যায়। এক) প্যারি কমিউনে কি কমপিটিশন ছিল? দুই) রাশিয়ার বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েত নিস্তেজ, কিন্তু প্যারি কমিউন কেন নিস্তেজ ছিল না? আমরা পরে কখনও এই প্রশ্নদুটির আলোচনা করব অন্য কোনও লেখায়। তার আগে আমরা নির্বাচনের প্রসঙ্গে ফেরত আসি। যা বলছিলাম, নির্বাচনে একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার আছে। কিন্তু এই কম্পিটিশন আর সোভিয়েতের কম্পিটিশন এক নয়। সেখানে একটা পার্টি কমিটি জাজ করত (নিশ্চয়ই)। আর এখানে জনতার ভোটে জাজমেন্ট হয়।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা প্রয়োজন, রাশিয়ায় সোভিয়েত সংস্থাগুলির একনায়ত্বের রাষ্ট্রে পুরনো জারতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মচারীদের একটা বড়ো অংশ রয়ে গেছিল। অর্থাৎ, সোভিয়েত বিপ্লব বা তার কয়েক মাস আগের কেরেনস্কির গণতান্ত্রিক বিপ্লব পুরনো রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ বিদায় করতে পারেনি।

২. ছ-সাত বছর আগে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'গণতন্ত্রের রহস্য' শিরোনামে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, গণতন্ত্র মানে সাম্বাৎসরিক ভোট নয়, অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা ঠিকঠাক চলাটা নয়। গণতন্ত্র মানে আমার বা আমার গোষ্ঠী বা আমার দল-এর ভালোর জন্য লড়াই নয়। গণতন্ত্র মানে 'যারা নানাভাবে নানাধরনে একেবারেই আমার অথবা আমাদের সদৃশ নয়, এমনকি চোর, ডাকাত, পাজি, বজ্জাত, বৈষ্ণব, গর্দভ, সকলকে সমান বলে মানতে হবে। শুধু তারা আমাদের সমান ভাবলে চলবে না; আমরা তাদের সমান এটা ভাবতে পারতে হবে জীবনে, মানতে হবে।

' অর্থাৎ, তিনি একটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলেছিলেন, যা আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের প্রদত্ত বা আগে-থেকে-আসা। বক্তৃতা এগোতে এগোতে তিনি এই আগে-থেকে-আসা গণতান্ত্রিক

মূল্যবোধের প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম তাত্ত্বিক রুশো–র মতটি বলেছিলেন, যে এটা ডিম আগে না মুরগী আগে–র মতো ব্যাপার। অর্থাৎ সমাজে আগে–থেকে–আসা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকতে হবে, তবে তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র (জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা) গড়ে উঠবে; আবার প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র না চালু হলে সমাজে ওই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধটি গড়েও উঠবে না -- রুশোর মতে এটা একটা বাস্তব কূটাভাষ বা প্যারাডক্স। স্পিভাক বলেন, তবে রুশো মনে করত, একবার যদি ওই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজে চলে আসে, তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই, ওটা থাকবে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র শুরুর সময় এটা দরকার। বা শুরুর কয়েকটি বছর ওই কূটাভাষটি জ্বালাবে। তারপর ওই কূটাভাষ আর থাকবে না, সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চিরস্থায়ী হবে, এবং প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র–ও।

এখানে স্পিভাক দ্বিমত পোষণ করে রুশোর সঙ্গে। রাষ্ট্রতত্ত্বের সাম্প্রতিক গবেষণা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চিরস্থায়ী নয়। বরং তা প্রতি প্রজন্মে পুনরাবৃত্ত করার প্রয়োজন আছে, কারণ প্রাক–গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিও (অর্থাৎ নিজেদের থেকে যারা অন্যরকম তাদের অসমান ভাবা বা উঁচুনিচু ভাবা) পুনরাবৃত্ত হয়। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি বা স্পিভাকের ভাষায় 'গণতন্ত্রের রহস্য' সমাজে বারবার পুনঃস্থাপন করতে করতে যেতে হয়, বা উল্টো করে বললে, সমাজকে 'এটার সঙ্গে ঘর করতে শিখতে হয়'। এবং এটা কখনোই প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের পাটিগণিতের শিক্ষা নয়। স্পিভাকের মতে এটা শিক্ষা বটে, কিন্তু তার সাথেই থাকতে হবে আন্দোলন এবং বিপ্লব। এবং এই তিন–টি চলতে হবে বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীর মধ্যে। 'আন্দোলন, বিপ্লব ও শিক্ষা -- এই তিনটি অসমানতালে একসঙ্গে কিন্তু বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠীর হাতে না চললে সমাজে গণতান্ত্রিক ধরণ বজায় রাখার আশা নেই।' স্পিভাকের মতে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র তবেই টিকবে। অর্থাৎ চলমান প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের প্রাকচাহিদা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চলমান সৃজন।

স্পিভাক কোনওভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র নাকচ করেননি, তার আবশ্যিক সাপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক হিসেবে বলেছেন 'সমাজে গণতান্ত্রিক ধরণ বজায় রাখা'–কে। সমাজের বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীর পরিচালনায় আন্দোলন, বিপ্লব, ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের শিক্ষা -- এই বয়ানের মধ্যে 'দল' ও 'সরকার' এর বদলে অন্য সামাজিক বিষয়ী ('সমাজের বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠী')–র কথা আছে। কিন্তু তা–ও সম্ভবতঃ ওই পরিপূরক হিসেবে। আমরা পরে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব অন্য কোনও লেখায়, ontorlin.wordpress.com ওয়েবসাইটে।

৩. ক্ষমতাকে দুই রকম বলেছিলেন ইতালীয় মার্ক্সবাদী আন্তোনিও নেগরি। একটি হল সাংবিধানিক ক্ষমতা বা গঠিত ক্ষমতা বা কনস্টিটিউটেড পাওয়ার। আরেকটি হল গঠনকারী ক্ষমতা বা কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার। প্রথমটিকে আরো সাধারণীকরণ করে বলা যেতে পারে ক্ষমতা। আর দ্বিতীয়টিকে শক্তি বা স্ট্রেংথ। নয়ের দশকের শুরুতে লেখা নেগরির বিখ্যাত বই 'গঠনকারী ক্ষমতা : আধুনিকতার বিকল্পের একটি বয়ান' সক্ষমতার রাজনীতি–র একটি বয়ান রচনা করেছিল। তিনি বলেছিলেন ক্ষমতা যেহেতু গঠনকারী ক্ষমতা না 'খেয়ে' বেঁচে থাকতে পারে না, কিন্তু আবার তাকে ভয়ও পায়; তাই গঠনকারী ক্ষমতাকে সময়ের নিরিখে অসাধারণ কিছু হিসেবে অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হিসেবে দেখায় (ক্ষমতার বানানো) আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন–এ। একইসাথে তাকে পরিসরের দিক থেকেও কোনও একটি উদ্দেশ্য সাধনকারী হিসেবে দেখায়। কিন্তু এইভাবে গঠনকারী ক্ষমতাকে বর্ণনা করা মানে হল গঠনকারী ক্ষমতাকে আগে থেকেই বেড়ি পরিয়ে রাখা।

গঠনকারী ক্ষমতার অধিবিদ্যার আলোচনায় নেগরি বলেন, গঠনকারী ক্ষমতা শূন্যতার আবর্ত থেকে উদ্ভূত।

> সামাজিক গঠিত হয় অনুপস্থিতির ভিতের ওপর দাঁড়ানো একটি শক্তি থেকে — বা বলা যায়, বাসনার ওপর দাঁড়ানো; এবং বাসনা শক্তিকে গতি জুগিয়ে চলে নিরন্তর। মানুষিক শক্তি তৈরি করে বাসনার এক ধারাবাহিক স্থানান্তর

এবং অনুপস্থিতির জোরালো উচ্চারণ যার থেকে তৈরি হয় উদ্ভাবনী ঘটনা। এই শক্তির সম্প্রসারণশীলতা এবং তার উৎপাদনশীলতা সীমাবদ্ধতার গহ্বরে অবস্থিত, ইতিবাচক নির্ধারণের অনুপস্থিতিতে অবস্থিত, অর্থাৎ এই পরিপূর্ণ অনুপস্থিতিতে অবস্থিত। গঠনকারী ক্ষমতা হল যা শূন্যতার আবর্ত থেকে উদ্ভুত, নির্ধারণের অনুপস্থিতির গহ্বর থেকে উদ্ভুত, যেন পুরোপুরি উন্মুক্ত অভাব। এই কারণে গঠনকারী শক্তি কখনও ক্ষমতায় পরিণত হয় না, জনতাও (multitude) কখনও সামগ্রিকতা হয়ে উঠতে চায় না, বরং তা হয়ে উঠতে চায় কিছু অনন্যতা, একটা উন্মুক্ত বহুত্ব।

ষোড়শ শতকের ইতালির মেকিয়াভেলির রচনা; সপ্তদশ শতকের ইংলন্ডে হ্যারিংটনের রচনা; অষ্টাদশ শতকের আমেরিকায় থমাস পাইন, থমাস জেফারসন, জেমস ম্যাডিসনের রচনা; ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে আবে সিয়েসের রচনা এবং ফরাসী বিপ্লবের টানাপোড়েনের প্রায় আশি বছরে ইউরোপে মার্ক্স সহ অনেকের ফরাসী বিপ্লবের ওপর রচনা; বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব ও লেনিনের রচনা — এছাড়াও আরও নানা বই পাঠ–এর মধ্যে দিয়ে (যেমন এডমুন্ড বার্কে–র লেখা রিফ্লেকশন বা তকভিই এর লেখা বই) নেগ্রি খুঁজতে থাকেন গঠনকারী ক্ষমতার বিষয়ীকে। রাজনৈতিক–এ অনুপস্থিত থেকেও উপস্থিত যে বিষয়ী নাম দেন তিনি জনতা বা মাল্টিচুড। তাহলে তা কি সামাজিক? নেগ্রি বলেন, জনতার শক্তিকে সামাজিক ব্যাপার বলে রাজনৈতিক ক্ষমতার থেকে আলাদা করা আসলে আধুনিকতার অবদান, ক্ষমতার হয়ে এই ভাগাভাগির মাধ্যমে জনতার শক্তিকে ভোঁতা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই যে জনতার শক্তি তা সবসময় থাকে, আধিভৌতিক হিসেবে; এবং তার গতিশীল, সৃষ্টিশীল, ধারাবাহিক, ও পদ্ধতিগত গঠনই হল রাজনৈতিক। যদিও এই রাজনৈতিক–এর সময় আসে, কিন্তু কখন আসবে তা বোঝা যায় না, অস্বচ্ছ। জনতার শক্তির চলমান প্রক্রিয়া তাকে ভেদ করে যায়। তখন জনতার শক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়। —

গঠনকারী ক্ষমতার আধিভৌতিক অস্তিত্ব নিজেকে দৃশ্যমান করে ওই বিশাল আগুনের মধ্যে, যা তার জনতাকে সঙ্গে নিয়ে পরিত্যক্ত জমানাগুলির রাস্তাঘাটকে আলোকিত করে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত আমাদের প্রজন্ম দেখেছে এই সময়ের প্রতি প্রেম, যা, যা কিছু মৃত তার সমস্ত প্রকাশের বিরোধিতা করে। জনতার আন্দোলন তার শক্তিকে ব্যক্ত করেছে প্রত্যেক জায়গায়; এই অসাধারণ বিশালাকার বল দেখায় যে সেটা ব্যতিক্রম নয়, বরং দেখায় এর অস্তিত্ববিদ্যাগত আবশ্যকতা।

এইভাবে নেগ্রি আমাদের ভাষায় যা সক্ষমতার রাজনীতি, তার একটি বয়ান রচনা করেন; যা জনতার আন্দোলন হিসেবে চলমান কিন্তু অদৃশ্য থাকে, বিপ্লবের সময় পর্যায়ে সেগুলি দৃশ্যমান হয় এবং ছেয়ে যায় দৃশ্যপট। এখানে নেগ্রি বিপ্লবের সময় পর্যায় হিসেবে উদাহরন দিয়েছেন ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স তথা পশ্চিম ইউরোপকে। নেগ্রি বিপ্লবকে কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে দেখেন না, তার মতে বিপ্লব হল পরিবর্তনের আন্দোলনের একটি সাধারণ ঘটনা — যা আসে যায় আসে যায় আসে যায় — এই অর্থে ধারাবাহিক এবং অপ্রতিরোধ্য চর্চা। তার আগ্রহ বিপ্লবের সময় পর্যায় নিয়ে যে সময়ে সময়ের গতি বেড়ে যায়। সময়ের এই ত্বরণ কেই তিনি বলেন গঠনকারী ক্ষমতার মৌলিক চরিত্র; অর্থাৎ গঠনকারী ক্ষমতার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় নয়া ক্ষমতার গঠনে নয়, সময়ের ত্বরণে। সময়ের গতি বেড়ে যাওয়াকে নেগ্রি বলেন সময়ের প্রতি প্রেম — এমার্জেন্সি, বা জরুরি সময়। এই জরুরি সময়ই হল ঘটনার আবির্ভাববিন্দু। এই জরুরি সময় 'গঠনকারী ক্ষমতা এবং বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্কের অস্তিত্ববিদ্যাগত সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছু নয়'। নেগ্রি বলেন, ওই জরুরি সময়ের মধ্যে এই জনতার শক্তির আবশ্যকতাকে চিনতে পারা এবং এই শক্তিকে আরো বেশি শক্তিশালী করা আমাদের কাজ।

নেগ্রির সক্ষমতার রাজনীতির বয়ান ফুকো–উত্তর পশ্চিমী দর্শনের বাস্তুতন্ত্রে একটি উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ; যা ক্ষমতাকে ফুকোর সর্বত্র ছেয়ে থাকা একটি বাস্তবতা–র একস্তরীভবন থেকে উদ্ধার

করে তাকে আধিভৌত এবং ভৌত এই দুই স্তরে স্থাপন করে — গঠিত ক্ষমতা এবং গঠনকারী ক্ষমতা। এটা করতে গিয়ে নেগ্রি তার প্রিয় মার্ক্সীয় দর্শনের শিক্ষা (মৃত শ্রম এবং জীবন্ত শ্রম) –র সরাসরি সাহায্য নেন। তা ছাড়াও আরো অনেক সমসাময়িক দার্শনিকের (দেল্যুজ, লাঁকা, দেরিদা, ফুকো, সিমন্দঁ ইত্যাদি) প্রভাব আমরা দেখতে পাই তার এই রচনায়। তবে তিনি এই গঠনকারী ক্ষমতাকে বলেন, অনুপস্থিত থেকে উঠে আসা; যা বলার মধ্যে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট। যদিও নেগ্রির অনস্তিত্ব বা নাথিং জরুরি সময় পরবর্তী সংশ্লেষের মধ্যে বিলীন হয় না, রয়ে যায়। রয়ে যায় 'অভাব' হয়ে, স্থানান্তরিত বা নয়া বাসনা হয়ে। কিন্তু কোন পরিসরে এই 'অভাব' এই বাসনার স্থানান্তরগুলি হয়? না। ক্ষমতার বাইরে কোনও পরিসরের কথা আমরা নেগ্রিতে পাই না। রক্তমাংসের মানুষের জাগতিক পরিসর নেগ্রিতে নেই। গণতন্ত্র যেভাবে রক্তমাংসের মানুষকে 'গণ' –তে সংকুচিত করে যে কিনা নিয়ম করে গুঁতো দেবে ক্ষমতাকে, নেগ্রির জনতা কি তাকে অতিক্রম করতে পারে? বিপ্লবের সময়কে আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না (নেগ্রির ভাষায়, অস্বচ্ছ) বললেও বিপ্লবকে যেভাবে ঢেউ–এর মতো ধারাবাহিকতা হিসেবে বলেন নেগ্রি, তা কি বিপ্লব–কে, তুরীয় ঘটনা–কে একটি জাগতিকতা প্রদান করে না? গঠনকারী ক্ষমতা যদি জনতার আন্দোলন রূপে একটি চলমান অস্তিত্ব তবে তো সেটাও জাগতিকতা, তাকে কীভাবে অভাব বা অনুপস্থিতি বা গহ্বর হিসেবে ভাবা যায়? এই প্রশ্নগুলো রয়ে যায়।

তবুও নেগ্রিতে যে উত্তরাধুনিক দিশা পাওয়া যায়, তার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন, ক) গঠনকারী ক্ষমতা নিরন্তর এবং তা গঠিত ক্ষমতার মধ্যে বিলীন হয় না, খ) গঠিত ক্ষমতার কাজ গঠনকারী ক্ষমতাকে রুদ্ধ না করে, বরং তা যাতে আরো ব্যাপকতা পায় তার জন্য আইন বানানো। ...

নেগ্রির এই বই–এর একটি সামগ্রিক আলোচনা ontorlin.wordpress.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।